KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5"x6"
Vol. & Number : 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12	Year of Publication : আশ্বিন ১৩২৫ কার্তিক ১৩২৫ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ পৌষ ১৩২৫ মাঘ ১৩২৫ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৫ Condition : Brittle ✓ / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

নতুন রূপকথা।

—:০:—

এক যে ছিল রাজা। রাজার নাম জীবনগুপ্ত, রাজার রাজ্য শাকদ্বীপ, রাজার রাজধানীর নাম মনে নেই। রাজার ধনৈশ্বর্য্যের অন্ত নেই, লোকজনের ইয়ত্তা নেই। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, দেউড়ীভরা দরোয়ান, বাগিচাভরা ফুল। রাজার সাত-মহলা পুরী পৃথিবীর বুক আঁকড়ে ধরে' আকাশ ফুঁড়ে একেবারে কোথায় উঁচু হ'য়ে উঠেছে—উপরে তাকিয়ে দেখলে দেখাই যায় না কোথায় তার চূড়া কোন্ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেছে। সাত-মহলা পুরী—তার মহলে মহলে দাস দাসী, মহলে মহলে চন্দন-কাঠের দরজা, মেহগনি কাঠের জানালা, দুধের মত সাদা শ্বেত পাথরের থামের উপরে উপরে আবীরের মত লাল রক্তপাথরের গম্বুজ—একেবারে কতদূর থেকে দেখা যায় যেন পলাশবনে পলাশ ফুটে আছে। সেই সব থামে থামে আবার কত কারু-কার্য্য, তার ইয়ত্তা নেই। কোথাও ময়ূর তার পেখম ফুলিয়ে রঙ্ বাহার খেলছে, কোথাও হাতী তার শুঁড় ঝুলিয়ে দিয়েছে, সিংহ তার প্রকাণ্ড থাবা পেতে বসে আছে, বাঘ রাগে বসে' গর্ গর্ করছে—এমনি সব কত কত শ্বেতপাথরের থামে থামে খোদাই করা। দেয়ালে দেয়ালে কত চিত্র। কোথাও সীতার বনবাস, কোথাও পঞ্চবটী, কোথাও মায়ামৃগ, কোথাও অশোকবন—এমনি সব কত কত

চিত্র নিপুণ তুলিতে চিত্রিত হয়ে দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। গম্বুজের ছাদে ছাদে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শতদল আঁকা—তারই পাশে পাশে আবার কতরকমের পাখী লতা পাতা। সাত মহলে রাজার সাত রাণী। সাতরাণীর গলায় মুক্তোর মালা, নাকে হীরের ফুল, কানে পান্নার দুল; তাদের মাথাভরা চক্‌চকে মিশমিশে কালো রেশমী চুলে গজমোতির হার; হাতে সোনার কাঁকন রাণীদের গায়ের রঙের সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে গেছে, আঙুলে আঙুলে লাল ডগ্‌ডগে চুণি-বসান আংটী; মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত হীরে চুনি পান্না জহরতে সাত রাণীর রূপ একেবারে জ্বল্ জ্বল্ করছে। সাতমহলা পুরীতে সাত রাণীকে নিয়ে রাজা সুখে রাজ্য করেন।

রাজা প্রতি বৎসর বসন্ত এলে বনোৎসব করেন। যখন প্রথম ফাল্গুনের হাওয়ার মাঝের মদের গন্ধ শীতবুড়ির নাকে ঢোকে, তখন শীতবুড়িটা যেন কিসের স্মৃতিতে শিউরে ওঠে, কিসের বেদনায় জেগে ওঠে। তার পরণের সাদা থানের কাপড়ে ধীরে ধীরে সবুজের আমেজ লাগে, মুখের বুকের হাতের ঢিলে চাম্‌ড়া সব নিটোল হ'য়ে আসে, চোখের শুক্‌নো চাউনি বিদ্যুৎভরা মেঘের মত হ'য়ে আসে—মাথায় কাশফুলের মত সাদা চুলের রাশ ভ্রমরের দলে ছেয়ে যায়—ফাটা পা দুটো কমলদলের মত হ'য়ে আসে, হাতের কাঠির মত আঙ্গুলগুলো চাঁপার কলি হ'য়ে জেগে ওঠে। তখন শীতবুড়িকে চেনে কার সাধ্য; তখন তার কালো চোখে বাঁকা চাউনি, পাকা ডালিমের কোয়ার মত লাল টুক্‌টুকে ঠোঁটের ফাঁকে যুথীর কলির মত দাঁত-দেখান হালকা হাসির রেখা, জরি-পেড়ে চুণি পান্নার বুটিদার গাঢ় সবুজ রঙের সাড়ীতে আর তার শরীর যেন ধরেই না;

সে সবুজ সাড়ীর চাইতেও যে সে অনেকখানি বেশি—এই কথাটা সে ভরা-বুক নিয়ে যেন জানিয়ে দিতে চায়। প্রতি ফাল্গুনে এমনি করেই শীতবুড়ির নবজন্ম হয়, আর রাজাও তাঁর সাত রাণীকে নিয়ে এমনি সময়েই বসন্তোৎসব করতে রাজধানী ছেড়ে চলে যান।

সেবার প্রথম ফাল্গুনের সঙ্গে সঙ্গে "ফাল্গুনী"র বাঁশী বেজে উঠল। বনে বনে গাছে গাছে পাতায় পাতায় পুলক লাগল। কোথা থেকে একটা ভুঁইচাঁপা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে তার কচি মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে আধ আধ কথায় গান সুরু করে' দিলে:—

"বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফির্‌ব না রে"।

কোথা থেকে একটা ছোট্ট চড়াই তার ছোট্ট বুক ফুলিয়ে গলায় গিটকিরি কেটে গান জুড়ে দিলে—

"আকাশ আমায় ভর্‌ল আলোয়
আকাশ আমি ভর্‌ব গানে"।

আমের মুকুলের গন্ধ ছোটার সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছি দলের ব্যস্ত ব্যাকুলতা জেগে উঠল, ঘন পাতার আড়াল থেকে স-তান কোকিল-ডেকে উঠল, বুল্‌বুল্ লতার গায়ে দোল খেতে খেতে পিউ পিউ করে' গলা সাধতে লাগল, দোয়েল ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে নতুন গোঁফ-ওঠা ছোক্‌রার মত শিষ দিতে লাগল, শালিখেরা পর্য্যন্ত হলদে ঠোঁট দিয়ে তাদের গিরিমাটির গা ঠোক্‌রাতে ঠোক্‌রাতে মহা আনন্দে তাদের বেসুরো গলায় কিচিরমিচির করতে লাগল। বনে

বনে লতা দুলল—পাতা কাঁপল—বাতাস ছুটল—চারদিকে মহাসাড়া পড়ে গেল। রাজা বললেন—"বসন্ত আগত, বনোৎসবের আয়োজন কর"।

রাজা বসন্তোৎসবে যাবেন। সাতমহলা পুরীর সাত মহল ডাক হাঁকে ভরে' উঠল। রাজপুরীর চার তোরণের নহবতে সানাইয়ের বুক চিরে ভৈরবী সুর ফুটে বেরল। কাড়া নাকাড়া দামামা মৃদঙ্গ রবাব বেণু বীণা মুরজ মুরলী করতাল জয়ঢাক সব একসঙ্গে বেজে উঠল। ঘোড়াশালে লক্ষ ঘোড়া ঘাড় বাঁকিয়ে চিঁ হিঁ হিঁ করে' তাদের আনন্দ জানাল, হাতীশালে হাজার হাতী তাদের শুঁড় আকাশে তুলে বিশাল নাদ করে' রাজার জয়ধ্বনি করে' উঠল। রাজা দুধের মত সাদা একটা ঘোড়ার উপরে সোয়ার হলেন; সাত মহল থেকে সাত রাণী বেরিয়ে এসে সাত দোলায় উঠলেন। রাজপুরীর বিশাল সিংহদ্বার খুলে গেল। রাজা সাদা ঘোড়ায় ঘোড়-সোয়ার হ'য়ে সাত দোলায় সাত রাণীকে নিয়ে সিংহদ্বার পথে বেরলেন—এমন সময় সেই সিংহদ্বার দিয়ে এক পরম সুন্দর পুরুষ প্রবেশ করে' রাজাকে অভিবাদন করে' দাঁড়াল।

—ওরে থামা থামা কে কোথায় আছিস! থামা সব কোলাহল, সব গীতবাদ্য, সব ডাক হাঁক, সব হাসি গান! ইঙ্গিতে সব থেমে গেল—কাড়া নাকাড়া দামামা মৃদঙ্গ রবাব বেণু বীণা মুরজ মুরলী করতাল জয়ঢাক সব যেন যাদুমন্ত্রবলে নীরব হ'য়ে গেল। নহবতে নহবতে সানায়ের হৃদয়-গলান সুর কানে কানে রেশ রেখে মিশিয়ে গেল, তুরঙ্গ সব বাঁকান-ঘাড় সোজা করল, হাতীর দল শুঁড় আস্ফালন বন্ধ করল। বাহকেরা সাত রাণীর সাত দোলা কাঁধ থেকে

মাটিতে নামালে; রাজা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। রাজার আর বনোৎসবে যাওয়া হ'ল না।

রাজা দেখলেন পরম সুন্দর পুরুষ। দীর্ঘ শরীর, উন্নত শির, তেজভরা চোখ, স্বাস্থ্যভরা দেহ; গায়ের রঙ, সে যেন গলিত কাঞ্চন—গায়ের কোনখানে টিপি দিলে যেন আঙ্গুলের দু'পাশ দিয়ে রক্ত ছুটে বেরবে, এমন স্বাস্থ্য। মাথা মুখ মুণ্ডিত। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কোন আবরণ নেই, কেবলমাত্র একটুকু কৌপীন। রাজা বিস্মিত হ'য়ে কিছুক্ষণ তাকিয়েই রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—"মহাশয়! আপনি কে"?

আগন্তুক উত্তর দিলেন—"মহারাজ! আমি সন্ন্যাসী"।

রাজা বললেন—"মহাশয় অজ্ঞতা ক্ষমা করবেন। সন্ন্যাসী কি? সন্ন্যাসী কে"?

সন্ন্যাসী উত্তর করলেন—"মহারাজ! সন্ন্যাসী সেই, যে সৎ অসৎ নাশ করে' নির্ব্বিকার হয়েছে। সেই পরম সত্য একই সত্য—সেই সত্য হচ্ছে ব্রহ্ম। এক ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা। মহারাজ, এই যে জগৎ দেখছেন, এ কেবল আমাদের মায়ার সৃষ্টি—আমাদের দৃষ্টির বিভ্রম"।

রাজা বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন—"মহাত্মন! এ জগত সব মিথ্যা? এই যে সংসার, ঐ যে আকাশ, এই যে ঘোড়া, ঐ যে হাতী—সব মিথ্যা"?

—"স্বপ্ন, মহারাজ, স্বপ্ন, ছায়াবাজী। হাতী কি থেকে বলছেন? ঘোড়া কোন্‌টাকে দেখছেন? আপনার যদি দৃষ্টি থাকত তবে দেখতে পেতেন, ও হাতীও নয়, ঘোড়াও নয়—খালি "ইলেকট্রনের" পুঞ্জীভূত সমষ্টি।

সুন্দর ফুল, সুন্দরী নারী, সুস্বাদ সোম—কোথায় মহারাজ?—আমি দেখছি কেবল ঈশ্বর। এই মিথ্যাকে চরম করে' মেনে পরম সত্য থেকে আমরা দূরে রয়েছি।"

রাজা এমন সব কথা কোনদিন শোনেন নি। তাই এ সব কথা শুনে উতলা হলেন। তারপর কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন—"মহাত্মন, ক্ষমা করবেন—আমার এখন সময় নেই—বসন্তোৎসবে বনে যেতে হবে। এ রাজ্যের এই রাজবংশের কোটি বছরের উৎসব এ—যা কোটি বছরের প্রত্যেক বছরটিতে সম্পাদিত হ'য়ে এসেছে। আমার পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, আবার তাঁর পূর্ব্বে যিনি ছিলেন—আবার তাঁর পূর্ব্বে তাঁর পূর্ব্বে তাঁর পূর্ব্বে—এমনি লক্ষ রাজার উৎসবের স্মৃতি নিয়ে এই উৎসব গড়ে উঠেছে। এ উৎসব বন্ধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। মহাত্মন, রাজপুরীতে অবস্থান করুন। এক মাস পরে উৎসব থেকে ফিরে এসে আপনার কথা শুনব। রাজপুরীতে যখন যা প্রয়োজন হবে অনুজ্ঞা করবেন—তৎক্ষণাৎ তা পালিত হবে"।

সন্ন্যাসী উত্তর করলেন—"মহারাজ, আমি সন্ন্যাসী—আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই। আপনি উৎসব থেকে ফিরে আসুন—আমি অপেক্ষা করব"।

সন্ন্যাসী বিদায় নিলেন।

—ওরে বাদ্যকরেরা থেমে রইলি কেন! তোরা সব বোকার মত সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন! বাজা বাজা—ঐ যে রাজা ঘোড়ায় উঠছেন—ঐ যে সাত রাণীর সাত দোলা বাহকেরা কাঁধে তুলে নিল—বাজা বাজা। চোখের এক পলক ফেলতে সোনার জীবন-

কাঠির স্পর্শে যেন সব জেগে উঠল—কাড়া নাকাড়া কাঁসি দামামা রবাব বেণু বীণা মুরজ মুরলী মৃদঙ্গ করতাল জয়ঢাক—সব বেজে উঠল কাড়া নাকাড়া ক—রর্‌র্ করে' উঠল, কাঁসি খন্ খন্ করে' উঠল, দামামা ডিম্ ডিম্ করে' উঠল, মৃদঙ্গ দম্ দম্ করে' উঠল, করতাল ঝম্ ঝম্ করে' উঠল, বেণু বীণা রবাব নানা মূর্চ্ছনা তুলল, জয়ঢাক ঢক্কা নিনাদ তুলল। লক্ষ ঘোড়া আবার ঘাড় বাঁকিয়ে মাটির গায়ে খুর ঠুকতে প্রাচির গায়ে লাগল, হাজার হাতী শুঁড় দুলিয়ে তাদের চাঞ্চল্য জানিয়ে দিল—রাজা সাদা ঘোড়ায় সোয়ার হ'য়ে সাত দোলাতে সাত রাণীকে নিয়ে বনোৎসবে যাত্রা করলেন। রাজা সঙ্গীসহচর নিয়ে সিংহদরজা দিয়ে প্রশস্ত রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন;—রাজপুরীর চার তোরণে নহবতে নহবতে সানইয়ে সানাইয়ে ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে বসন্ত-বাহারে সুর উঠতে লাগল—

"গন্ধে উদাস হাওয়ার মত
উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।"

রাজা বনে এলেন। রাজার পিছনে সাত দোলায় সাত রাণী, তার পিছনে লক্ষ ঘোড়া, তার পিছনে হাজার হাতী, তার পিছনে বাদ্যভাণ্ড দাসদাসী অনুচর নিয়ে রাজা বনে এলেন, বসন্তোৎসব করবার জন্যে।

বনের অপূর্ব্ব শোভা। বনের বুক একেবারে পুরে উঠেছে—তালে তমালে শালে শিমুলে আমে জামে বকুলে পারুলে অশোকে অশ্বত্থে একেবারে ভরে' উঠেছে। লক্ষ রকমের লক্ষ গাছ তাদের

ঘন পাতার চামর ঝুলিয়ে দিয়েছে ; কেবল সবুজ আর সবুজ আর সবুজ—চোখ-জুড়োন সবুজে সবুজে একেবারে চারদিক জড়িয়ে গেছে, চারিয়ে গেছে—সেই সবুজের বুকে বুকে আবার রঙের ঢেউ। সাদা লাল হল্‌দে গোলাপী বেগুনে নীল জরদ—একেবারে রঙে রঙে রঙ্‌বাহার। তারই মাঝে আবার মত্ত বাতাসের মাতামাতি, বাতাসে বনে নতুন করে' পরিচয়, নতুন করে' চিরদিনের প্রশ্নোত্তর। বাতাস ছুটতে ছুটতে একখানে থমকে দাঁড়িয়ে যায়—ঘাড় বাঁকিয়ে প্রশ্ন বর্ষণ করতে থাকে—

কে গো তুমি ? আমি বকুল !
কে গো তুমি ? আমি পারুল !
তোমরা কেবা ? আমরা আমের মুকুল গো—

আবার সেখান থেকে ছুট্ দিয়ে আর একখানে থমকে দাঁড়িয়ে যায়—আবার জিজ্ঞেস করতে লেগে যায়—

তুমি কে গো ? আমি শিমুল !
তুমি কে গো ? কামিনী-ফুল !
তোমরা কেবা ? আমরা নবীন পাতা গো—

আবার সেখান থেকে চট্ করে' ছুট্ দিয়ে কোন এক অশ্বত্থ গাছের আগডালে উঠে দোল খেতে খেতে গান ধরে' দেয়—

"এই কথাটাই ছিলেম ভুলে
মিল্‌ব আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।'

"অশোকবনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠ্‌বে জিয়া,
বুকের মাতন টুট্‌বে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে,
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।"

রাজা সন্ন্যাসীর কথা একেবারে ভুলে গেলেন। লক্ষ গাছের লক্ষ ডালে লক্ষ দোলনা চড়ল—মহানন্দে বনোৎসব আরম্ভ হল।

বনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিচয় ত আজকার নয়, একদিনের নয় ; ও পরিচয় সেই আদিম কালেরও আগে হ'তে—সেই কাল, যে-কালে বনের মানুষ ছিল বন-মানুষ। বনের সবুজকে যখন মানুষ হৃদয় দিয়ে আবিষ্কার করে, তখন ত বন কেবল বনই নয়—বনের চাইতেও সে অনেকখানি বেশি। মানুষের হৃদয়ের রঙ যে তখন বনের সবুজকে উজ্জ্বল করে' তোলে। সে তখন নির্জ্জীব নয়, মূক নয়—তখন সে হাসে, খেলে, গান গায়। ওই গানই ত চাঁদনী রাতে হাল্‌কা হাতে আকাশের গায়ে জ্যোৎস্নার আলপনা টানতে টানতে বিদ্যুৎবরণ পরীরা বেণু বনে বনে শুনতে পায়—

"ওগো দখিণ হাওয়া, পথিক হাওয়া
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে !
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া,
পরশ-খানি দাও বুলিয়ে।
আমি পথের ধারের ব্যাকুল-বেণু,
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু,"

"আহা এস আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।"

ওই গানই ত অপ্সরীরা তারা-জাগা উষায় তাদের সারা নিশার অভিসার থেকে ফিরবার পথে ঘুমন্ত চোখে ফুলন্ত গাছে গাছে শুনতে পায়—

"ওগো নদী আপন বেগে
পাগল পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।
আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা।"

ওই গানের সঙ্গে যখন মানুষও গান গাইতে শেখে তখন ত সে মৃত্যুকেই বড় বলে মানতে চায় না। কিন্তু যাক সে কথা!

এক মাস পরে রাজা বন থেকে বসন্তোৎসব শেষ করে' রাজধানীতে ফিরে এলেন। রাজপুরীতে এসেই মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন —"মন্ত্রী সন্ন্যাসী কোথায়? তাঁর কাছে আমায় নিয়ে চলুন।" মন্ত্রী রাজাকে সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে গেলেন।

রাজা সন্ন্যাসীকে দেখে একেবারে চম্‌কে উঠলেন! এই সেই সন্ন্যাসী যাঁকে তিনি মাত্র এক মাস আগে দেখেছিলেন। কোথায় সে

নধর তনু—উন্নত শির তেজভরা চোখ, স্বাস্থ্যভরা দেহ, কাঞ্চনের মত বর্ণ? সে মুখে যেন কে কালি মেখে দিয়েছে—সে চোখে যেন কে কুজ্‌টিকা ভরে' দিয়েছে—প্রশস্ত ললাটে চাম্‌ড়া কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছে—সারা শরীরটা একেবারে ঝুনো নারকেলের মত চিম্‌সে হ'য়ে উঠেছে। রাজা বিস্ময় প্রকাশ করে' সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলেন—"মহাত্মন, আপনার একি পরিবর্ত্তন"?

সন্ন্যাসী তাঁর অত্যন্ত শুষ্ক ঠোঁটে একটু হাসি এনে মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন—"মহারাজ, গত একমাস আমি অনাহারে আছি"।

ক্রোধে রাজার চোখ দুটো জ্বলে উঠল—শরীর থর্ থর্ করে' কেঁপে উঠল—বুকের উপর রত্নরাজি ঝক্ ঝক্ করে' জেগে উঠল—কোষের অসি ঝন্ ঝন্ করে' বেজে উঠল—রাজা মন্ত্রীর দিকে চোখ ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কঠোর কণ্ঠে বললেন—"এ কি ব্যাপার মন্ত্রী? আমার যে রাজ্যে কোনদিন সামান্য একটি পিঁপড়ে পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকে না, সেই রাজ্যে রাজার অতিথি হয়ে রাজপুরীতে অবস্থান করে' একমাস কাল অনাহারে!—মন্ত্রী এর অর্থ কি"? ক্রোধে রাজার বাক্ রুদ্ধ হয়ে এল, মুখে আর কথা সরল না।

মন্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর করলেন—"মহারাজ এ দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। কিন্তু মহারাজ, বনোৎসবে যাবার সময় এ দাস সন্ন্যাসীর নিজ মুখ থেকেই শুনেছিল যে তাঁর কিছুরই প্রয়োজন নেই—তাই এ দাস তাঁর আহারের কোন আয়োজন করে নি। সন্ন্যাসীও কোন অনুজ্ঞা করেন নি"।

রাজা সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে বললেন—"মহাত্মন, আপনার আহার্য্য কি"?

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন—"মহারাজ, আমি যখন কুরুবর্ষের রাজ-প্রাসাদে অবস্থান করছিলেম, তখন প্রতিদিন রাজভাণ্ডারী দশসের করে' দুধ আমার আশ্রমে রেখে যেত"।

রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করে' বললেন—"মন্ত্রী, রাজগোশালায় শ্রেষ্ঠ যে গাভী তিনটি রয়েছে সেই গাভী তিনটি সন্ন্যাসীর সেবায় নিযুক্ত হোক"।

—"যে আজ্ঞা মহারাজ"।

রাজা সন্তপ্ত ও ব্যথিত অন্তঃকরণে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

(২)

প্রশস্ত রাজসভা। রাজা সভা করে' বসে' আছেন। রূপোর ঝালর লাগান চুনি পান্নার চুমকি বসান চন্দ্রাতপ—তারই নীচে সোনার ঝালর লাগান প্রশস্ত রাজছত্র—তারই নীচে সুবর্ণনির্ম্মিত রত্নখচিত রাজসিংহাসন। রাজসিংহাসনে রাজা—মাথায় তাঁর রাজ-মুকুট, হাতে তাঁর রাজদণ্ড। রাজমুকুটে কত কত মণি মরকত প্রবাল—তাদের বুকে বুকে আলো প্রবেশ করে' আবার ছুঁচের মত সূক্ষ্ম আর বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ হ'য়ে বেরিয়ে এসে চারদিকে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ছে। রাজাকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘিরে কত কত পাত্র মিত্র অমাত্য সভাসদ্, কত কত বৈদেশিক রাজ-প্রতিনিধি। সভাসদ্‌দের উষ্ণীষের রত্নরাজিতে আলো প্রতিফলিত হ'য়ে সভামণ্ডপ চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করছে, দ্বারে দ্বারে সদ্যফোটা ফুলের মালা ঝোলানো, তারই মাঝে মাঝে আবার চোখ-জুড়োন আম্র-পল্লবের মঙ্গল ইঙ্গিত। রাজসভা স্তব্ধ নীরব—একটুকু কোনখানে নড়াচড়া নেই। এ যেন

সত্যিকার রাজসভা নয়—এরা যেন সত্যিকারের মানুষ নয়। এ-যেন একখানা নিপুণ তুলিতে পটে-আঁকা ছবি।

ধীরে ধীরে সভামণ্ডপের বাইরে মন্দিরার ঠিনি ঠিনি মিষ্টি শব্দ উঠল—তারপর তারই সঙ্গে সঙ্গে বৈতালিক-কণ্ঠে রাজার মঙ্গলাচরণ গীত উঠল। একবার, দু'বার তিনবার ফিরে ফিরে বৈতালিকেরা রাজার গুণগান করে' রাজার জয়ধ্বনি করে' উঠল, এমন সময়ে সভামণ্ডপের বৃহৎ দ্বার দিয়ে ধীর পাদবিক্ষেপে উন্নত-শিরে সন্ন্যাসী রাজসভায় প্রবেশ করলেন।

চকিতে রাজসভা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। চক্ষের পলকে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করে' উঠে দাঁড়ালেন। রাজার পাশে রাজমন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন, অমাত্যরা উঠে দাঁড়াল, পাত্র মিত্ররা উঠে দাঁড়াল, সভা-সদেরা উঠে দাঁড়াল, বৈদেশিক রাজ-প্রতিনিধিরা উঠে দাঁড়াল। সন্ন্যাসী তাঁর আজানুলম্বিত অনাবৃত বাহু উত্তোলন করে' সবার উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ বাণী উচ্চারণ করলেন। রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এগিয়ে এসে সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা করলেন, তাঁকে নিয়ে গিয়ে আপনার সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বের আসনে বসায়ে রাজা সিংহাসনে বসলেন, পাত্রমিত্র আমাত্য সবাই তখন নিজ নিজ আসন গ্রহণ করল।

তারপর রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করে' জিজ্ঞাসা করলেন—"মন্ত্রী রাজ্যের কুশল ত"?

—"মহারাজ——" মন্ত্রীর মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। মন্ত্রীর কথা কেড়ে নিয়ে সন্ন্যাসী উত্তর করলেন—"মহারাজ কুশল কোথায়? যেখানে রাতদিন ধরে' মিথ্যার পূজো চলছে—আগা থেকে গোড় পর্য্যন্ত অনৃতের লীলা চলছে—সেইখানে কুশল? মরুভূমির তপ্ত

বালি নিঙড়িয়ে সলিল-বিন্দু মিলবে? বাসনার বহ্নির মাঝে স্নিগ্ধতার আশা? বিষবৃক্ষ কি চন্দন তরু হয়? পঙ্কে ডুবে কি রত্ন আহরণ করা যায়? মহারাজ কুশল নেই—অনৃতের ধ্বংস না করতে পারলে কুশল নেই"।

রাজসভা বিস্মিত হ'য়ে প্রায় রুদ্ধ-শ্বাসে সন্ন্যাসীর কথা শুনতে লাগল। কারো চোখে পলক পড়ল না। কে ইনি? মানুষ,—না স্বয়ং ভগবান মনুষ্যদেহ ধারণ করে' মর্ত্তে এসেছেন!

শুধু মন্ত্রী তাঁর মাথা-ভরা পাকা চুল হেলিয়ে স-সম্ভ্রমে সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করে' বললেন—"মহাত্মন! আমি দার্শনিক নহি, সুতরাং যা আমি দর্শন করি তাকে অদৃশ্য বলে মানতে পারি নে। রাজকার্য্যে আমার চুল পেকে গেল, মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। মহাত্মন! সেই সাহসেই আজ আমি বলতে দ্বিধা করব না যে রাজ্যের কুশল"—তারপর রাজার দিকে ফিরে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—"মহারাজ রাজ্যের সর্ব্বত্র কুশল। রাজ্যে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হয়েছে, প্রজাদের ঘরে ঘরে প্রচুর অন্ন, রাজা জীবনগুপ্তের নামাঙ্কিত পতাকা উড়িয়ে বাণিজ্যতরণীর বহর পৃথিবীর সপ্ত-সমুদ্রের তরঙ্গমালার পরিচয় নিচ্ছে, শিল্পকলার নব নব সৃষ্টিতে সমাজের মনের সৌন্দর্য্যের ও প্রাণের সজীবতার চিহ্ন ফুটে উঠছে, সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনায় সমাজ-জীবন সম্পদশালী উদার হ'য়ে উঠছে। মহারাজ! দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত আনন্দময়। নরনারীর প্রাণের আনন্দে রাজ্যের আকাশ বাতাস আকুলিত। সেই আনন্দই ত উন্নত সৌধ-ঘেরা নগরীতে নগরীতে, পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা পল্লীতে পল্লীতে পুলক ছড়িয়ে আনন্দ-আলয় গড়ে'

তুলেছে—সেই আনন্দের আলো লেগেই ত বৃক্ষবাটিকায় তরুশ্রেণী সতেজ হ'য়ে আকাশের পানে আপনাদের মাথা নির্ভয়ে তুলে দেয়, সেই আনন্দেই ত সহস্র কল্লোলিনী সহজ গতি-ভঙ্গিমায় পৃথিবীর বুক কেটে কেটে শ্যামল ক্ষেতে আপনার স্নেহরস অপর্য্যাপ্ত করে' বিলিয়ে সাগরাভিসারিকা। মহারাজ! রাজ্যের সর্ব্বত্র কুশল। রাজরাজেশ্বর জীবনগুপ্তের রাজ্যে সারা বর্ষ ধরে' বসন্তোৎসব চলছে"।

সন্ন্যাসী ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—"মহারাজ, মহারাজ! আমরা কেবলই জাল বুনছি—উর্ণনাভের মত আমাদের অন্তর থেকে আকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম সূতো বের করে' কেবলই স্বপ্নের জাল বুনছি। তারই উপরে আবার অজ্ঞানের তুলি চালিয়ে হাওয়ার মত অদৃশ্য রঙ দিয়ে আকাশ-কুসুম আঁকছি—এর শেষ কোথায় মহারাজ? কিসে এর সমাপ্তি মহারাজ? এর শেষ অমৃতে নয়—বিষে, আনন্দে নয়—হতাশায়, হাসিতে নয়—অশ্রুতে; মহারাজ! এর শেষ সংবাদ মৃত্যু। মহারাজ, ইলেকট্রনের মায়া ধ্বংস করতে' না পারলে অমৃতের সাক্ষাৎ মিলবে না"।

মন্ত্রী বিনীত কণ্ঠে বললেন—"মহাত্মন! এর শেষ সংবাদ মৃত্যু হোক্, কিন্তু সেই মৃত্যুকেই বড় করে' দেখব কেন? আমার বয়েস আশী পেরিয়ে গেছে, হয়ত' কাল মৃত্যু হবে। মৃত্যুর পরপারে কি আছে?—হয় অনন্ত জীবন, নয় বিরাট শূন্য; কিন্তু আমার ঐ আশী বৎসরের জীবনকে ছোট করে' এক মুহূর্ত্তের মৃত্যুকেই বড় করে' দেখব কেন? অনন্ত কালের কোলে আশী বছরও যে আমি ছিলেম এইটেই যে আমার গৌরব"।

সন্ন্যাসী মন্ত্রীর কথা শেষ হতে না হতেই বলে উঠলেন—"কে

ছিল, কি ছিল মন্ত্রী?—ছিল শুধু স্বপ্নের বোনা সূক্ষ্ম জাল—ছিল শুধু আকাঙ্ক্ষার বোনা স্থূল জঞ্জাল—ছিল না, যা চরম ও পরম, যা অক্ষয় ও অব্যয়, যা অবিনশ্বর ও ঈশ্বর"—কথা বলতে বলতে সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ দু'টি উৎসাহে উদ্দীপিত হ'য়ে উঠল, তাঁর মুখমণ্ডল অনিন্দ্য সুন্দর জ্যোতিতে মণ্ডিত হয়ে গেল। আজানুলম্বিত দুই বাহু তুলে সমস্ত রাজসভার দিকে তাঁর মহত্বোজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন—"বল একবার ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা"। তাঁর সে কণ্ঠস্বরে সভামণ্ডপের বিরাট কক্ষ গুম্ গুম্ করে' উঠল, দ্বারে দ্বারে সদ্য-ফোটা ফুলের মালা সব কেঁপে উঠল, রাজছত্রের সোনার ঝালর নড়ে উঠল, চন্দ্রাতপের চুনি পান্নার চুমকি সব ছল্ ছল্ করে' উঠল, আর রাজমুকুটের মধ্যমণি মহামরকতটা যেন নিঃশব্দে একটুকু হেসে উঠ্‌ল, রাজসভার কেউ সন্ন্যাসীর জ্যোতির্মণ্ডিত মুখমণ্ডলের দিক থেকে আর চোখ ফিরাতে পারলে না—যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত সমস্ত রাজসভা সমস্বরে ধ্বনি করে' উঠল—"ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা"।

সন্ন্যাসী রাজ-সিংহাসনের দিকে ফিরে রাজাকে সম্বোধন করে' বললেন—"মহারাজ! আমি আপনার রাজ্যে ধর্ম্ম প্রচার করতে চাই, অপনার প্রজাবৃন্দকে সত্যের পথে অমৃতের পথে অমরত্বের পথে নিয়ে যেতে চাই—অনুমতি দিন"।

রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করে' বললেন—"মন্ত্রী, শিপ্রানদীর তীরে সন্ন্যাসীর জন্য বৃহৎ মঠ নির্ম্মিত হোক্। আর রাজকোষ থেকে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা সন্ন্যাসীকে দক্ষিণা দেওয়া হোক্"।

পক্বকেশাবৃত মস্তক অবনত করে' মন্ত্রী বললেন—"যে আজ্ঞা মহারাজ"।

(৩)

শিপ্রা অশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে। সারা দিনমানে তার অস্থির বুক রোদে চিক্‌মিক্—চাঁদনীরাতে তার তরল হৃদয় জ্যোছ্‌নায় ঝিক্‌ঝিক্, দিন নেই, রাত নেই, শিপ্রা কলকল ছল ছল করে' গান গেয়ে গেয়ে ব'য়ে চলেছে। স্তব্ধ দুপুর বেলা যখন তমাল-তালীর বনে বনে প্রাণ-উদাসকরা ঘুঘুর ডাক থেকে থেকে জেগে ওঠে, তখন সেই নিস্তব্ধতার মাঝে শিপ্রার দু'তীরের ঘন দেবদারু বনেরা তাদের মাথা হেলিয়ে শিপ্রাকে বুঝি জিজ্ঞেস করে—ওগো শিপ্রা, তুমি গান গেয়ে গেয়ে কোথায় চলেছ?—আর শিপ্রা তার উত্তর দেয়—

গান গাহিয়া চল্‌ছি আমি সেই দেশেতে যেথায় গো
আকাশ গায়ে সাগর শুয়ে ঊর্ম্মিমালায় খেলায় গো,
অসীম নভে অগাধ জল
কর্‌ছে সদাই ছল ছল
চল্‌ছি আমি সেই দেশেতে গান গেয়ে মোর বীণায় গো।

চল্‌ছি আমি সেই দেশেতে দুল্‌তে সুনীল দোলাতে
চল্‌ছি আমি অস্তিমেতে পারব খেলায় ভুলাতে
আমার গীতি আমার গান,
স্নিগ্ধ করি হৃদয় প্রাণ
গগন তলে সিন্ধুবুকে পারব কোথায় মিলাতে।

চল্‌ছি আমি সেই সুনীলে যেথায় সবই পুলক গো
গভীর জলের শান্তশীতল অসীম নভের আলোক গো,
আলোক যেথায় পুলক যেথায়
শব্দ যত স্তব্ধ যেথায়
লব্ধ যেথায় গল্প গীতে এই নিখিলের চালক গো।

গান্‌টী আমায় শিখিয়েছে বিশ্বপতির করুণা
এই গানেতেই ধরিত্রী ও রাত্রি দিবস মগনা
সুরু গানে সাঙ্গ গানে
সৃজন লীলার রঙ্গ গানে
এই গানই গো সজ্জামহীর নইলে মহী নগনা।

ওই গানেতে উঠ্‌বে জাগি আছিস্ যারা ঘুমায়ে
মুক্তি বিহীন মর্ম্মহীনের ধর্ম্মখানি জড়ায়ে,
বদ্ধ হয়ে রুদ্ধ ঘরে
মলিন মুখে আঁখির 'পরে
অবিশ্বাসীর হাস্যটুকু দিবস যামি ছড়ায়ে।

উঠ্‌রে জাগি আলোর মাঝে জীবন পথের আনন্দে,
মর্ম্মতলের দেবতা সেই মোহন মধু সু-ছন্দে,
নৃত্যে তারি তালে তালে
হাস্যে তারি ছল ছলে,
উঠ্‌বে জাগি লাস্যে তারি বর্ণে গীতে গন্ধে।

উঠ্‌রে জাগি উষায় যখন রক্ত রবি কিরণে,
পৃথ্বী তলের দূর্ব্বারাশি জড়ায় হিরণ বরণে,
উঠ্‌রে জাগি ক্লান্ত সাঁঝে
দিন্‌টী যখন রক্ত সাজে
অন্ধকারে ধরে যখন লুটায় মহীর চরণে।

উঠ্‌রে জাগি জীবন পথে উঠ্‌রে জাগি মরণে,
উঠ্‌রে জাগি মিলতে হবে বিশ্বপতির চরণে,
উঠ্‌রে জাগি—ছুটতে হবে
উঠ্‌রে জাগি—লুটতে হবে
শিপ্রা যেমন রঙ্গে নাচি' লুটায় সাগর-চরণে।

এমনি করে' শিপ্রা ছুটে চলেছে—লক্ষ পল্লীকে ঘিরে ঘিরে, হাজার নগর নগরীকে বেড়ে বেড়ে নেচে নেচে দুলে দুলে ফুলে ফুলে ফেনা ছড়িয়ে ছড়িয়ে জঞ্জাল কুড়িয়ে কুড়িয়ে অক্লান্ত গতিতে ব'য়ে ব'য়ে চলেছে—আপন প্রাণের স্নিগ্ধতা কোমলতা শীতলতা অপর্য্যাপ্ত স্নেহরস ধরিত্রীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে এমনি করেই শিপ্রা সাগরাভিসারিকা। সেই শিপ্রারই তীরে এক বিরাট মঠ নির্ম্মিত হল—রাজ-আজ্ঞায়—সন্ন্যাসীর জন্য।

বর্ষা শেষ হ'য়ে গেল। শরতের সোনার রঙ জগত ভরে' ফুটে উঠল। সন্ন্যাসী তাঁর মঠে যাবার জন্যে রাজপুরী ত্যাগ করে' রাজপথে বেরুলেন। রাজপথে অগণ্য লোকের সারি চলেছে—রাজপথের পাশে পাশে অসংখ্য দোকানে বেচা কেনা চলছে। সন্ন্যাসীকে যে দেখল সেই মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল। পথিক পথ ভুলে গেল—দোকানে

ক্রেতা বিক্রেতারা বেচা কেনা ভুলল—নাগরিকদের গৃহে গৃহে বন্ধ-জানালা সব খুলে গেল—তা দিয়ে অসংখ্য কুলাঙ্গনারা পলক হীন চোখে সন্ন্যাসীকে দেখতে লাগল। কত কিশোরী তাঁকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করল—কত প্রৌঢ়া বৃদ্ধা তাঁকে পুত্র বলে বাঞ্ছা করল—সন্ন্যাসীর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—তিনি সোজা চলেছেন আপনার গন্তব্য স্থানে। সবাই জিজ্ঞেস করে—কে ইনি? মানুষের মুখে মুখে কথার রঙ চড়ে। কেমন করে' রটে গেল যে কিছু দিন আগে স্বয়ং মহাদেব রাজাকে স্বপ্নে দেখা দেন—দেখা দিয়ে বলেন যে তিনি শীঘ্র মনুষ্য দেহ ধারণ করে' তার রাজ্যে উপস্থিত হবেন—এই সন্ন্যাসীই সেই মহাদেব। সন্ন্যাসী মঠে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে মঠের চারিদিক লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল—সেদিন দিন ফুরুতে না ফুরুতেই সন্ন্যাসী লক্ষ শিষ্য করলেন—মঠের চূড়া থেকে এক প্রকাণ্ড গৈরিক পতাকা উড়ল। বাতাসে সেই গৈরিক পতাকা সারা দিনমানে পত্ পত্ করে উড়ে উড়ে যেন বলতে লাগল—"মি—ত্থ্যা"—"মি—তথ্যা"।

সন্ন্যাসীর লক্ষ শিষ্য পঙ্গপালের মত সমস্ত শাকদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ল—ধর্ম্ম প্রচারের জন্যে। ধনীর অট্টালিকায়, বণিকের বাণিজ্যালয়ে, গৃহস্থের গৃহে, দরিদ্রের কুটিরে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—"ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা।" নগর নগরীর কোলাহলের মাঝে, শান্ত পল্লীর নীরবতার মাঝে, সবুজ বনের শ্যামলতার মাঝে কেবল ঐ রব ধ্বনিত হতে লাগল—"ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা।" শাকদ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন গৈরিক হ'য়ে উঠল—রোদের রঙ্ যেন গৈরিক রেণুতে ভরে' উঠল—বাতাস যেন গৈরিক গন্ধে পূর্ণ

হয়ে গেল—নীল আকাশ যেন গৈরিক রাগিণীতে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"। ওরে কি আছে?—কিছুই নেই, আমি নেই, তুমি নেই, জগত নেই—কিছুই নেই। ওরে এসব কিসের জন্যে—এই পরিশ্রম, এই কর্ম্ম এই ভোগ? থামাও থামাও সব মূর্খের দল যদি মঙ্গল চাও। এমনি করেই দিন কাটতে লাগল। দিনে দিনে মাস কাটল—মাসে মাসে বছর কাটল—বছরে বছরে কত বছর কেটে গেল—ধীরে ধীরে নর নারীর প্রাণের অস্থি শিথিল হ'য়ে এল—ক্রমে ক্রমে জীবনের অমৃত স্বাদহীন হ'য়ে উঠল—এ সৃষ্টির শব্দ গন্ধ রূপ রস অর্থহীন বোঝা হ'য়ে পড়ল—ধনীর ভোগসামর্থ্য লয় পেয়ে গেল—মানুষের কর্ম্মসামর্থ্যে বাজ পড়ল—বণিকের বাণিজ্যালয় বিশৃঙ্খলায় ভরে' উঠল—কৃষকের লাঙ্গলের মুটো ঢিলে হ'য়ে পড়ল। সবার মুখেই ঐ এক বাণী—জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। কত কত ধনীর অট্টালিকায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল—কত কত বণিকের বাণিজ্য তরণী বিনা ঝড়ে মারা পড়ল—কত কত গৃহস্থের বাসস্থান অমনি অমনি জ্বলে' উঠল—ক্ষেতে ক্ষেতে হালের বলদ অমনি অমনি মারা পড়ল। মানুষের অস্বীকারে সব অকৃতার্থ হ'য়ে উঠল। মন্ত্রী গিয়ে রাজসমীপে নিবেদন করলেন—"মহারাজ রাজ্যের ভীষণ অমঙ্গল উপস্থিত। দুর্ভিক্ষ আসন্ন।"

"দুর্ভিক্ষ আসন্ন? সে কি মন্ত্রী! দুর্ভিক্ষ আসন্ন! আমার রাজ্যে—যে রাজ্যে প্রতি বৎসর তিন বৎসরের উপযুক্ত শস্য উৎপন্ন হয়—সেই রাজ্যে দুর্ভিক্ষ! মন্ত্রী, আপনার ভুল হ'য়ে থাকবে—আপনার অবসর গ্রহণের কাল উপস্থিত বুঝি।"

দুঃখের হাসি হেসে মন্ত্রী উত্তর দিলেন—"আমার ভুল হয় নি—

আমি সত্য সংবাদই রাজ সমীপে নিবেদন করছি। রাজ্যে প্রকৃতই দুর্ভিক্ষ আসন্ন। দেশের নর নারীরা জীবনে আস্থা হারিয়েছে, জীবনের আনন্দকে তাড়িয়েছে। কৃষক আর তেমন উৎসাহে তেমন করে, লাঙ্গল ধরে না—তার লাঙ্গলের মুঠো শ্লথ হ'য়ে আসে, মাতা ধরিত্রীকে আর সে তেমন চোখে দেখে না, সে আজ তার কাছে প্রাণহীন অস্তিত্ব-হীন, এই অবজ্ঞার বিনিময়ে সে আগে যে শস্য পেত তার দশমাংশের এক অংশ পায়, বাণিজ্যের শিল্পের অবনতি ঘটেছে, বণিকের চোখে এ জগৎটা তার কারাগার, অসুখের জায়গা অমঙ্গলের স্থান, তার বাণিজ্য-তরণী আজ কেবল কাঠের ভেলা, তার মধ্যে মানুষের প্রাণ নেই মন নেই আনন্দ নেই। বণিকের প্রাণের পুলকে আজ সপ্তসিন্ধুর তরঙ্গমালা কল্ কল্ ছল্ ছল্ করে না, তাঁর জীবনের অবজ্ঞায় তার বিশাল বুক আজ ফুলে ফুলে উঠছে, তার কল্ কল্ ছল্ ছল্ অট্টহাসিতে পরিণত হয়েছে, তাই তার বাণিজ্য-তরণী বিনা ঝড়ে মারা পড়ে। দার্শনিকেরা সূর্য্যের আলোকে নাকচ করে দিয়ে অমাবস্যার অন্ধকারের বুক চিরে স্বর্গের জ্যোতি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টায় ব্যস্ত। সাহিত্যে কেবল পরলোকে বাঁচবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মহারাজ—"

রাজা বিচলিত হলেন, মন্ত্রীর কথা শেষ না হতেই বললেন, "মন্ত্রী আমি পরিদর্শনে বের হব, প্রস্তুত হও।"

রাজা ও মন্ত্রী দু'জনে ছদ্মবেশে রাজপুরীর গুপ্তদ্বার দিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন।

রাজা ও মন্ত্রী রাজপথ ধরে' চলতে লাগলেন। রাজপথের দু'ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তায় নরনারী চলছে। সব যেন লক্ষ্মীহীন শ্রীহীন। রাস্তার দু'ধারের সৌধমালার ভিতর থেকে

যেন একটা নিঃশব্দ ক্রন্দনের রোল ঘুরে ঘুরে উঠে আকাশে মিশে যাচ্ছে, নর-নারীরা সব যেন অর্দ্ধমৃত, তাদের সে উৎসাহদীপ্ত আনন নেই, তড়িতোজ্জ্বল চোখ নেই, যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে আপনাদের নিরেট দেহটাকে বোঝার মত ব'য়ে নিয়ে চলেছে আর ভাবছে কবে এর হাত থেকে উদ্ধার পাবে। দোকানে দোকানে বেচা কেনা চলছে, যেন কলের দোকানে কলের মানুষেরা কলের সাহায্যে হাত পা নাড়ছে, চারিদিক মৃত্যুর ছায়াতে সব কদর্য্য হ'য়ে উঠেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা—যেন তার মধ্যে বাস করছে সব "মম্মি" রা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাণিজ্যালয়—যেন সেখানে বসে' রয়েছে সব প্রেতাত্মারা, বাহির থেকে সেই সবই আছে, নেই কেবল সেই ভিতরের প্রাণের তড়িৎ—যে তড়িতের স্পর্শে সব সুন্দর হ'য়ে উঠবে সার্থক হ'য়ে উঠবে, অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। রাজা সব দেখলেন, তাঁর চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হ'য়ে এল। রাজা রাজধানী ছাড়িয়ে জনপদ ছাড়িয়ে পল্লীতে প্রবেশ করলেন।

রাজা দেখলেন পল্লীর সে চোখ-জুড়োন চেহারা আর নেই। পত্রবহুল বৃক্ষরাশি যেন সব কৃপণ হ'য়ে উঠেছে, যা নেহায়ৎ না হলে নয় সেই কটা পাতা গায়ে জড়িয়ে তারা কঙ্কালের মত ডাল মেলে দিয়ে জড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে, ক্ষেতে ক্ষেতে আর সে শ্যামল শোভা আপনার মায়া বিস্তার করে হাসে না। দীঘির জলে আর মরাল মরালীরা সে আনন্দে সাঁতার কাটে না, পল্লী-আকাশ আর তেমন শিশুদের হাস্য কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে না, স্তব্ধ দুপুরে ছায়ায় ঢাকা বটগাছের তলে আর রাখাল বালকের বাঁশীতে তেমন সুর ফোটে না—আর সে পল্লীদেবালয়ে সান্ধ্য আরতির কাঁশর বেজে

ওঠে না। ভরা-জ্যোছনায় আর সে ঠাকুরমায়ের মুখে রূপকথার স্বপ্নের জাল বোনা নেই, সে সাধ আহ্লাদ সুখ সম্পদ যেন কোন্ এক যাদুকরের মায়া প্রভাবে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। দূর্ব্বাবিরল মাঠে মাঠে হাড় বের-করা গাভীর দল প্রাণপণে তাদের আহার্য্য আদায় করবার চেষ্টায় ধুকছে, পল্লীপাশ দিয়ে শীর্ণা নদী দীনা ভিখারিণীর মত থেমে থেমে জিরিয়ে জিরিয়ে আপনার প্রাণহীনতার পরিচয় দিয়ে দিয়ে অস্ফুট ক্রন্দনে চলছে। রাজা যেখানেই যান সেখানেই কেবল শোনেন—"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। কি হবে রে ভাই মিথ্যার জঞ্জাল বাড়িয়ে কোনরকমে দুটো দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই ভাল"। রাজা সব দেখলেন, সব শুনলেন, তারপর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মন্ত্রী এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি"?

মন্ত্রী উত্তর দিলেন—"মহারাজ! মানুষ ধরিত্রীকে অস্বীকার করেছে, নিজেও তাই নিরর্থক হ'য়ে উঠেছে। মানুষের প্রাণহীনতায় তার চতুষ্পার্শের প্রকৃতি নির্জ্জীব আনন্দহীন হয়ে উঠেছে, মহারাজ! আপনার জীবনের প্রতি মানুষ প্রেম হারিয়েছে তার বিনিময়ে সে লাভ করেছে কেবল মৃত্যু। এরা আজ মনে করতে শিখেছে যে ইহলোকের দুঃখ পরলোকের সুখ হয়ে দেখা দেবে, ইহলোকের অক্ষমতা পরলোকে সামর্থ্য হয়ে ফুটে উঠবে, এদের ধারণা মহারাজ, ইহলোকে নরক ভোগ করাই পরলোকে স্বর্গ লাভের সহজ ও সত্য উপায়"।

রাজা বিরাট দুঃখের ভার বুকে করে' রাজপুরীতে ফিরে এলেন।

ধীরে ধীরে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অন্ন বস্ত্র অগ্নিমূল্য হয়ে উঠল। যেখানে এক টাকায় আট মণ চাল মিলত সেখানে আট

টাকায় এক মণ চাল মেলে না। যেখানে তাঁতির বাড়ীতে চার আনা পয়সা ফেলে দিয়ে এলে এক জোড়া কাপড় মিলত সেখানে চার টাকায় একখানা কাপড় পাওয়া যায় না। চারিদিকে হতাশা নিরাশা, কেবল হাহাকার। দেশের কত লোক একবেলা খেয়ে থাকল, কত লোক আধপেটা খেয়ে দিন কাটাতে লাগল। আর কত লোক মরে গেল। কিন্তু দেশের লোকের এ দুর্দ্দশা প্রাণে প্রাণে অনুভব করবারও শক্তি নেই—এমনি তারা প্রাণহীন। সবাই মনে করতে লাগল যে এ পৃথিবীর বুঝি এই রকমই ধারা। তখন দ্বিগুণ জোরে নরনারী-কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হতে লাগল "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"। এই মিথ্যার কাছ থেকে যত শীঘ্র বিদায় নেওয়া যায় ততই ত সুবিধা। ঘরে ঘরে আরও পরিধেয় বস্ত্র গেরুয়া রঙে রঙিন হয়ে উঠল।

(৪)

এই রকম যখন শাকদ্বীপের অবস্থা তখন এ সংবাদ গুপ্তচর-মুখে জম্বুদ্বীপের রাজা হুনেশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছিল।

রাজা হুনেশ্বর সিংহাসনে বসে ছিলেন, সংবাদ শুনে একেবারে সিংহাসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। "কি বললে, কি বললে গুপ্তচর? এই রকম অবস্থা? জম্বুদ্বীপের রাজা হুনেশ্বর তার পিতা মুষলেশ্বর, তার পিতা বাণেশ্বর, তার পিতা চণ্ডেশ্বর এমনি সাত পুরুষ ধরে' শাকদ্বীপ জয় করবার চেষ্টা করেছে; আর বার বার পরাভূত হয়ে ফিরে এসেছে। আজ শাকদ্বীপের এইরকম অবস্থা! সেনাপতি, সাজাও সাজাও, সৈন্য সাজাও"। রাজা হুনেশ্বর সেনাপতিকে যুদ্ধ যাত্রার জন্যে সৈন্য সাজাতে আদেশ করলেন। তুরী ভেরী বেজে উঠল,

অসি ঝন্‌ঝনা জেগে উঠল, বর্ষাফলক চিকমিক করে উঠল। পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য, দশ হাজার হাতি, বিশ হাজার ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে রাজা হুনেশ্বর শাকদ্বীপের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন।

রাজা জীবনগুপ্ত খবর পেলেন, হুনেশ্বর আসছে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দশ সহস্র হাতি বিশ সহস্র ঘোড়া নিয়ে শাকদ্বীপ জয় করতে। মন্ত্রীকে ডেকে বললেন—"মন্ত্রী রাজ্যের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে পরোয়ানা জারি কর যে স্বদেশরক্ষার্থে আবার আজ অস্ত্র ধারণ করতে হবে, শাকদ্বীপের চিরশত্রু জম্বুদ্বীপের রাজা আজ সসৈন্যে আবার সমাগত। দেশের সমস্ত সমর্থ লোক সমবেত হোক, জম্বুরাজ যেন আবার পরাজয়-পুরস্কার নিয়ে ফিরে যায়"।

রাজ অনুচর ছুটল দিকে দিকে রাজার পরোয়ানা নিয়ে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে, দেশের যুবক দলকে আহ্বান করতে। রাজ অনুচরেরা সমস্ত নগর নগরীতে প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে রাজার পরোয়ানা জারি করলে, রাজ-আহ্বান জানিয়ে দিলে, তার পর তারা এননি এমনি রাজপুরীতে ফিরে এল, তাদের সঙ্গে কেউ এলো না।

সেনাপতি নিজে বেরুলেন—সমস্ত দেশবাসীকে ডেকে ডেকে বললেন, "স্বাধীনতা হরণের জন্যে শত্রু আগত, ওঠো জাগো, যার বাহুতে কিছুমাত্র বল আছে, ধমনীতে বিন্দুমাত্র শোণিত আছে, দস্যুর হাত থেকে দেশ রক্ষার্থে, দাসত্বের কবল থেকে স্বাধীনতা রক্ষার্থে, বেরিয়ে এসো অগণ্য পল্লীর অসংখ্য কুটীর থেকে, সংখ্যাহীন নগরীর উচ্চ সৌধমালার ভিতর থেকে, অগণিত মানুষের দল, অদম্য অপরাজেয় অরিন্দম। সেনাপতির বাণী কারো প্রাণে কোন ঢেউ তুললে না, সে

বাণী আকাশে অমনি মিশিয়ে গেল। সেনাপতি একাকী রাজপুরীতে ফিরে এলেন, সঙ্গে কেউ এলো না।

রাজা নিজে বেরুলেন। তাঁর প্রজাদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "এসো শাকদ্বীপের বীরের দল, আমাদের পিতৃপিতামহরা যেমন করে' জম্বুরাজগণকে, তাদের বাহিনীকে বার বার পরাজিত করে পৃষ্ঠ করে নষ্ট করে শাকদ্বীপের প্রত্যন্ত দেশ থেকেই বিতাড়িত করেছিলেন, তেমনি করে আজ আমরা হুনেশ্বর আর তার বিশাল চমূকে বিধ্বস্ত করে তাড়িয়ে দেব। পরধনলোলুপ হুনেশ্বরের দু'চোখ আজ শাকদ্বীপে নির্ম্মিত বর্শাফলকের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করুক, তার সৈন্যেরা আজ শাকদ্বীপের বীরবৃন্দের তরবারীর ধার অনুভব করুক, এস বীরের দল, আর সময় নেই, শত্রু দ্বারে সমাগত"। রাজার কথা সবার এক কান দিয়ে প্রবেশ করে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাজা ফিরে এলেন, কেউ এল না।

রাজা হুনেশ্বরের জয়ধ্বনি নিকট থেকে নিকটতর হ'তে লাগল। শাকদ্বীপের চারিদিকে কোথায়ও মৃদুকণ্ঠে কোথাও মৃতের কণ্ঠে, কেবল রব উঠতে লাগল—"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"।

রাজা হুনেশ্বর দ্রুতবেগে শাকদ্বীপের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলেন, স্বচ্ছন্দ গতিতে, কোনখানে কোন বাধা নেই, কোথাও একখানি তরবারী তাঁর পথ আগলে বসে নেই, কোনখান থেকে একখানি বর্শা তাঁর সৈন্যের আরে এসে পড়ল না। রাজা জীবনগুপ্ত মাথায় করাঘাত করে' সিংহাসনে বসে' পড়লেন। "কি হবে মন্ত্রী, কি হবে! আপন স্বাধীনতা রক্ষার্থে একটি লোক অগ্রসর হোল না। দেশরক্ষা কে করবে? লোক নেই। রাজকোষে কুবেরের ধন সঞ্চিত,

কি হবে? লোক নেই। অস্ত্রাগারে অপর্য্যাপ্ত অস্ত্র মজুত, কি হবে? লোক নেই—লক্ষ সৈন্যের বর্ষব্যাপী রসদ্ মজুত, কি হবে? লোক নেই"। নিরাশায় রাজার চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল।

রাজা হুনেশ্বর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। গৃহে গৃহে সমস্ত দরজা জানালা রুদ্ধ, রাজপথে পথে আর সেদিন বাতি জলল না, একটি লোক চলল না, চারদিক স্তব্ধ মৃত্যুর মত নীরব, যেন কোন এক প্রেতপুরী। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার গভীর কালো হ'য়ে উঠল, হুনেশ্বর তাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দশ হাজার হাতি বিশ হাজার ঘোড়া নিয়ে এসে রাজপুরীর উত্তর দ্বারে হানা দিলেন, সেই সময় সেই আঁধারে রাজা জীবনগুপ্ত তাঁর সাত রাণীর হাত ধরে' চোখের জল মুছতে মুছতে দক্ষিণ দ্বার দিয়ে রাজপুরী ত্যাগ করে গেলেন।

(৫)

রাজা জীবনগুপ্তের সিংহাসনে রাজা হুনেশ্বর বসে'। রাজা গুপ্তচরকে আহ্বান করে' জিজ্ঞেস করলেন—"গুপ্তচর, প্রবল প্রতাপান্বিত এই শকজাতি, যাদের কত শতাব্দী ধরে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা জয় করতে পারে নি, সেই শকজাতির আজ এ দশা কেন?"

গুপ্তচর বললে—"মহারাজ! এই রাজ্যে দশ বৎসর পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী আসেন, তিনি প্রচার করেন যে, তিনি অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই আবিষ্কার করেছেন যে এই জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। সেই শিক্ষাকে অবলম্বন করে শকজাতি এ জগতটাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে

দিয়ে আপনাদের আনন্দহীন প্রাণহীন করে তুলছিল, তারই প্রতিশোধ এই দুর্দ্দশা"।

রাজা হুনেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—"সে সন্ন্যাসী এখন কোথায়"?

গুপ্তচর উত্তর দিলে—"তিনি এখন শিপ্রাতীরে তাঁর মঠে অবস্থান করছেন"।

রাজা বললেন—"তাঁকে আমার সমীপে নিয়ে এস"।

সন্ন্যাসী রাজা হুনেশ্বরের সমীপে নীত হ'ল। রাজা হুনেশ্বর, আপনার গলা থেকে বহুমূল্য মণিহার খুলে নিজ হাতে সন্ন্যাসীর গলায় পরিয়ে দিলেন। বললেন—"মহাত্মন, আমার পিতৃপিতামহরা সাত পুরুষ ধরে' অস্ত্র দিয়ে যা করতে পারেন নি, আপনি এক পুরুষে শাস্ত্র দিয়ে তাই করেছেন, সম্রাট হুনেশ্বরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ও এই যৎকিঞ্চিৎ উপহার গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করুন"।

তরপর সম্রাট তাঁর সেনাপতির দিকে চেয়ে বললেন--"সেনাপতি, সন্ন্যাসীকে আমার সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে রেখে আসবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হোক, তার জন্যে এক মাস সময় দিলেম, সন্ন্যাসীকে জানিয়ে দেওয়া হোক, ঐ এক মাস পর থেকে তাঁকে কোন দিন আমার সাম্রাজ্যের সীমানায় দেখতে পেলে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে"।

সেনাপতি তরবারি কোষমুক্ত করে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন—"যে আজ্ঞা মহারাজ"।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দৃষ্টি।

——:❋:——

শরতের একমুঠা রৌদ্ররে জমায়ে
যে পদ্ম উঠেছে বেড়ে, তাই দিয়ে গড়া
দু'খানি মধুর আঁখি,—দু'টি পক্ষ্মছায়ে
সুগভীর স্বচ্ছলতা কূলে কূলে ভরা।
তারি মাঝে দৃষ্টিখানি করুণ-কাতর,
বাহুপুটে আলিঙ্গন মেলিয়াছে তার
বেপমান দৃষ্টি-বাহু—আত্মার অধর
পাঠায়েছে চুম্বনের চারু পুষ্পাধার!
ব্যাকুল বক্ষের দোরে আসন্ন উদ্যত,
অসমাপ্ত চিরন্তন দৃষ্টির চুম্বন—
বিদ্যুৎপ্রবাহে চিত্ত মুগ্ধ মন্ত্রহত ;
এত বল কোথা পেল ও ভীরু নয়ন!
দু'টি আঁখি—একখানি দৃষ্টি—তারি মাঝে
নিখিল বিশ্বের লীলা নিঃশেষে বিরাজে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

ঝিলে জঙ্গলে শীকার।

——:❋:——

(৩)

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

তোমাদের একটা কথা বলা ভাল, যে পায়ের চিহ্ন দেখে বাঘ কি বাঘিনী বুঝে নেওয়া যায় ; চিতাদের সম্বন্ধেও একথা খাটে। বাঘের দাগ অনেকটা চৌকাগড়ণের, বাঘিনীর তা নয়। গোল বাধে কখন জান ?—বাচ্চাদের বেলায়। তাদের পায়ের দাগ দেখে বাঘ কি বাঘিনী বুঝে নেওয়া দায়। কিন্তু একটি সহজ উপায়ে এ সমস্যার মীমাংসা করা যেতে পারে, পায়ের একটা দাগ হতে অন্য দাগের ব্যবধান কতখানি, দেখলে সেটা সহজে বোঝা যায়। পায়ের দাগের আকার দুয়েরি সমান, খোকা-বাঘের পায়ের ফাঁদ খাট, আর খুকির লম্বা। এটা নজর করে দেখা ভাল, কোনও জীবেরই শিশুহত্যা করা ভাল নয়। এদের বেঁচে বর্ত্তে বড় হতে দেওয়া উচিত, এতে যদি তোমার হাতের শীকার ফস্‌কে অন্যের হাতে গিয়ে পড়ে তবুও এ স্বার্থ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

বাঘ কিম্বা চিতা কি করে গরু মোষ মারে, এ খবরটা জানতে সবারই কৌতূহল হয়। এ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য যদিও আমার ঘটে নি, তবে হত্যাকাণ্ড সমাধা হবার অব্যবহিত পরেই আমি উপস্থিত

হয়েছি। হত জন্তুটির পিঠে কিম্বা ঘাড়ের পাশেই আক্রমণকারীর দাঁতের দাগ দেখা যায়, আর যে ভাবে ঘাড়টি ভেঙে ঝুঁকে পড়ে, তা দেখলে বোঝা যায় শত্রুপক্ষ নিরীহ জন্তুটির উপর ব্যাঘ্র-ঝম্পনে এসে, সম্মুখের পায়ের থাবা দিয়ে ধরে' তার ঘাড় মটকে ভেঙে দেয়। মারবার পরেই তাকে মুখে করে, কিছু দূর টেনে নিয়ে কোন ঝোপের আড়ালে কিম্বা তলায় রাখে, শকুন হাড়গিলে কিম্বা মাংসাশী জন্তুদের মুখ হতে তাকে রক্ষা করবার জন্যেই এই কাজ করে। অনায়াসে এ ভার সে বহন করে। আমি একবার মস্ত একটা মোষকে এম্নি করে টেনে তিন ফুট চওড়া একটা নালার অন্য পাড়ে রাখতে দেখেছিলাম। এম্নি অবলীলাক্রমে এই বিপুল ভার বয়ে নিয়ে গিয়ে রাখলে যে, সে দিকে যে মাটীর ঢিবি ছিল তাহ'তে এক আঁজল ধূলোও খসে পড়ল না। পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল বাঘটি প্রকাণ্ড, আর সে অতবড় মোষটিকে বেড়াল যেমন তার ছানা-মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেম্নি সহজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এতে তার গায়ে কি পরিমাণ সামর্থ্য ছিল, তা অনায়াসেই অনুমান করতে পারো।

এসম্বন্ধে আমাদের দেশে সাধারণত অজ্ঞতা এতদূর যে, অনেকেই গম্ভীর ভাবে বলেন, "কাপ্‌ড়া চাই মেম্ সাহেব" বলে যে ফেরি-ওয়ালারা সহরের অলি গলিতে ফেরে, ব্যাঘ্রবীরও তাদেরই মত তার শীকারের বোঝা পিঠে করে বয়ে' নিয়ে যায়। আর একটি হাস্যকর ধারণা এই যে, বাঘ গিয়ে মোষ কিম্বা গরুর ল্যাজে কামড় দিয়ে ধরে, দুটোতে খুব খানিকটে টানা হিঁচড়া চলে, তারপর সুযোগ বুঝে চতুর বাঘ মোষের ল্যাজের টানটা আলগা করে দেয়, আর সে যেম্নি মুখ থুবড়ে পড়ে আর অম্নি ইনি গিয়ে তার ঘাড়ের উপর চেপে বসেন।

এই হচ্ছে মামুলি বিশ্বাস, আর তুমি যদি এর বিপরীত কিছু বল, তা হলে সেটা তোমারই অজ্ঞতা বলে' প্রতিপন্ন হবে। এখানে আর একটা গল্প না বলে' এগিয়ে চলাটা ঠিক হয় না। একবার সুন্দরবনে বাঘে একজন নাপিতকে দিনে দুপরে আক্রমণ করেছিল, ধূর্ত্ত নাপিত ভয় পাবার পাত্র নয়, সে করলে কি জান?—তার পুঁটুলি হতে নরুণটি না বার করে বাঘের গলায় বসিয়ে দিলে, আর যাবে কোথা? বাঘ আর পালাবার পথ পায় না, কিন্তু পালাবার যো কি? চতুর নরসুন্দর ততক্ষণ তার লেজ ধরে আটক করেছে; ফলে কি দাঁড়াল জান?—থলের মুখ ফাঁক পেলে ইঁদুর যেমন পালায়, বাঘটি তেমনি করে দে চম্পট, কিন্তু আলাঙ্গুল ডোরাকাটা বাঘছাল খানি, বিজয়ী নাপিত ভায়ার হাতেই রয়ে গেল! দুঃখের বিষয় এমন অপূর্ব্ব ঘটনা অতঃপর আর ঘটবার সম্ভাবনা নেই। সেরূপ নাপিত একটি মাত্র ভূভারতে জন্মেছিল, মরণ কালে এমন অসম্ভব বীরত্ব সে সঙ্গে করেই নিয়ে চলে গেছে। যে ভদ্রলোক এ গল্পটি আমায় বলে ছিলেন, তিনি পরে জর্ম্মান দেশে অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করতে যেয়ে মারা গিয়েছেন, কিন্তু গল্পটি অমর হয়েই আছে।

চিতার শীকার পদ্ধতি কিন্তু ভিন্ন, সে ঘাড়ে গিয়ে পড়ে না, গলায় কামড় দিয়ে ধরে থাকে, জন্তুটি মরে পড়ে গেলে, তবে তাকে ছাড়ে। লোকে বলে রক্ত শুষে খাবার জন্যে সে এম্নি করে, কিন্তু এটাকে মেনে নেওয়া চলেনা, কেননা এসম্বন্ধে প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নি।

আমি যতদূর জানি, তাতে বলতে পারি, চিতা আহার্য্য সম্বন্ধে অনেকটা সাত্বিক, বাঘের মত অমন তামসিক নয়। সে উচ্ছিষ্ট কিম্বা পর্য্যুসিত আহার করে না, আর তা ছাড়া চিতা পরের শিকার-করা

জন্তু আহার করে না। বাঘের অত বাচ-বিচার নেই, যা পায় তাই খায়, তবে ক্ষুধার তাড়নায় সুবোধ স্বভাবের জন্যে নয়! আমি দেখেছি একটি ছোট অথচ পূর্ণবয়স্ক বাঘ একবার বাঘিনীর শিকার-করা একটি মোষ অধিকার করে বসে ছিল, তারপর যার সম্পত্তি, সে আসবামাত্র "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই নীতিবাক্য শিরোধার্য্য করে অবিলম্বে পলায়ন করলে। এ ব্যাপার যেখানে ঘটেছিল শুনেছি সেইখানেই এক বাঘিনী পরের শীকার চুরি করে খেয়ে বেড়াত, কিন্তু যখন বন্দুকের গুলিতে মারা পড়ল, তখন দেখা গেল তার খেহখানি একেবারে অস্থি চর্ম্মসার। কারণ অনুসন্ধান করে আবিষ্কার হল যে, তার টাকরায় অনেকগুলো সজারুর কাঁটা আটকে রয়েছে, আর কতকগুলো বিঁধে তার চোয়াল ফুটো হয়ে গিয়েছে, মুখের চারিদিকে মৌচাকের মত ঘায়ের সমষ্টি, এ অবস্থায় চুরি করে খাওয়া ত দূরের কথা, মুখের গোড়ায় খাবার এগিয়ে এলেও, খাওয়া তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই বহুদিনের উপবাসে দেহখানি হাড়ের মালায় পরিণত। একজন মস্ত শীকারী আমায় বলেছেন, তিনি একবার একটা বাঘ মারার পর দেখেছিলেন তার সম্মুখের হাতে মস্ত একটা সজারুর কাঁটা বিঁধে আটকে ছিল।

বাঘ আর চিতা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে কত বড় হতে পারে, সে কথা অনেক শীকারের বইয়ে দেখতে পাওয়া যায়—কিন্তু নানা শীকারীর নানা মত, তাই মাপ করবার নিয়ম সবার সমান নয় বলে' এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দেখা যায়! বাঘ বন্দুকের গুলি খেয়ে মরবার অব্যবহিত পরেই, তার লম্বাই চওড়াই কতখানি সেটা মাপা উচিত; কেননা দেরি হলে দেখা যায় তার শরীর সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে। আমি

একবার দশফুট লম্বা একটা বাঘ শীকার করি, জঙ্গল হতে তাঁবুতে বয়ে নিয়ে আসা, এই সময় টুকুর মধ্যে পাঁচ ছয় ইঞ্চি কমে গিয়েছিল। এতে আমার বন্ধুদের ভারী আমোদ বোধ হয়েছিল, ব'লে রাখা ভাল যে সে দিন তাঁদের ভাগ্যে কোন শীকারই জোটে নি! মৃত্যুর পর সব জন্তুর শরীরই শক্ত হয়ে ওঠে, তবে বাঘদের দেহে এই কাঠিন্য যত শীঘ্র দেখা দেয়, অন্য পশুর শরীরে তা হয় না। চামড়া ছাড়িয়ে নিলে বাঘটা যে কত বড় ছিল তার কোন খবরই পাওয়া যায় না। প্রকৃতি-মাতা এ জাতীয় জন্তুদের যে পোষাকটি পরিয়ে দেন, তা' তাদের দেহে এঁটে বসে না, আলগা থাকে। এর উদ্দেশ্য এদের দেহে যে ক্ষত হয়, সেটা চামড়াতেই আটক থাকে, মাংসে গিয়ে না পৌঁছয়, তা হলে প্রাণ হানির সম্ভাবনা অধিক। এদের গায়ে আঘাত-ক্ষত সর্ব্বদাই হচ্ছে—সেটা যাতে চামড়ার উপর দিয়েই যায়, বেশি সংঘাতিক না হয়, এই নিয়ত বিপদ নিবারণের জন্যেই প্রকৃতি তাদের দেহের আচ্ছাদনটি ঢিলে রেখেছেন। বাঘের চামড়া ছাড়িয়ে নেবার পর দু'ফিট আন্দাজ বেড়ে যায়, চিতাবাঘের এর অর্দ্ধেক বাড়ে। একই দৈর্ঘ্য এবং আয়তনের বাঘ ও চিতা কিন্তু ওজনে সমান হয় না। একটা বড় বাঘের ভারে একখানি বড় শক্ত চারপাই মড় মড় করে ভেঙে পড়তে আমি দেখেছি। চিতা ওজনে একমণ ৩৫ সেরের বেশি হতে প্রায় দেখা যায় না, একটি বড় বাঘ কিন্তু সাড়ে সাত মণ পর্য্যন্ত হতেও পারে, এমনটা যদিও সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে ছিল। সেই কথা মনে পড়ে গেল, একটা বাঘের গায়ে গুলি লাগে নি, পালাবার সময় যেখানটিতে শীকারীরা ঘেরাও করেছিল, সে সেই দিকে ছুটে যেতেই আর সবাই পালিয়ে গাছে উঠে

পড়ল, এক বেচারী তাড়াতাড়ি উঠতে না পেরে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল, তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, সে সেই খানটিতে পড়ে মরে আছে, ঘাড়টি মটকান, নখের কিম্বা দাঁতের কোন চিহ্ন শরীরের কোথাও ছিলনা। পলায়নতৎপর ব্যঘ্ররাজ হয়ত একবার সন্তর্পণে তার ঘাড়ে হাত রেখেছিলেন (প্রণয়ীর সলজ্জ প্রথম সম্ভাষের মত!) তাতেই তার এই দশা, একেবারে "পপাত চ-মমার চ"। এ হ'তেই জন্তুটির ওজন যে কি, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

সামর্থ্য আর নিষ্ঠুরতায় আর কেউ বাঘের সমান না হ'লেও, এরা কিন্তু বুনো কুকুরকে ভারী ডরায়। বনচর জন্তুদের মধ্যে এই কুকুরদের মত ঘৃণ্য স্বভাবের আর কোন পশু নেই। এরা একবার যে বনে এসে দেখা দেয়, আর সবাই আতঙ্কে সেখান হ'তে সুদূরে পলায়ন করে। ব্যঘ্ররাজও এই "যেনগতা পন্থার" অনুসরণ করেন। আর একটা কারণও থাকতে পারে, শীকারই যদি সব পালান, তবে শীকারী আর সেখানে বসে কি করবে বল? ভালুক আর পাহাড়ি-চিতা বুনো কুকুরকে তেমন ডরায় না, তার কারণ এরা সহজে গুহা গহ্বরে আশ্রয় নিতে পারে। আমার একবারকার শীকার এদের উপদ্রবে একেবারেই মাটী হয়ে গিয়েছিল।

বাঘ, সাম্বর, অন্য মৃগপাল সব কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়ে গেল, আমি পথ চেয়ে চেয়ে বসে যখন ফিরে এলাম তখন শুনলাম, তার দু'দিন পরে বাঘ ভালুক হরিণ নীলগাই সবাই বাসায় ফিরে এসেছিল। এই বুনো কুকুরের দল ভারী চালাক; এক জায়গায় জড় হয়ে না থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, একই জন গিয়ে, এক একটা পাহাড়ের চূড়ায়

ওঠে, আর অন্যরা শীকার তাড়িয়ে তাদের দিকে নিয়ে যায়। সাম্বর-হরিণ প্রায়ই এদের ফাঁদে পড়ে, কারণ প্রকাণ্ড ডালপালাওয়ালা শিং নিয়ে এরা বনের মধ্যে দিয়ে শীগ্‌গির দৌড়ে পালাতে পারে না। এই কুকুরের দলের এক আধটিকে মেরে ফেললেও আর গুলোকে ভয় খাওয়ান যায় না, কিন্তু ঘায়েল করে যদি চলচ্ছক্তি রহিত করতে পারা যায়, তাহলে কাজ কতকটা হয় বটে। এরা কিন্তু মানুষের কোন হানি করে না। এই শয়তানদের কথা শেষ করবার আগে এক জন স্কচ (Scotch) শীকারী তাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা সর্ব্ব সাধারণে জ্ঞাত করান কর্ত্তব্য। তিনি বলেন—"জন্তুদের মধ্যে এদের মত খেঁকী, বেয়াদব, পাজী জানোয়ার আর দুটি নেই" (The most snarling, ill-mannered and detestable of beasts). এমন সকল শব্দের উপযোগীতা ততক্ষণই আছে, যতক্ষণ না তার অপব্যবহার হয়। এম্নি একটি দুর্দ্দশাগ্রস্থ শব্দ (d-d) নিশ্চয়ই আদিম মানব-প্রবর "আদমের" মুখ হতে রাগের মাথায় প্রথম জন্মলাভ করেছিল,—আর এ রাগটার উৎপত্তি যে ইবা-র (Eve) ব্যবহারে হয় নি এ কথা কে সাহস করে বলতে পারে? আইন যাঁদের পেশা, তাঁরা বলবেন এম্নি আর একটি বহু প্রাচীন প্রথা তাঁহাদের ব্যবসায়ে প্রচলিত আছে—সেটা হচ্ছে alibi, এটাও নিশ্চয়ই আদিম-পাপের মতই পুরাতন। আদম যিহোবার বিচার কালে এই alibi গরহাজিরের অছিলা করেছিলেন—কিন্তু বিফলে।—আমাদের জজ সাহেবরাও যদি এ কথাটা জানতেন, তাহলে তাঁদের হাতে কি জবর নজিরই থাকত!

একবার একটা চিতা, হঠাৎ কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যে অন্তর্দ্ধান হ'ল তা আর কারো বোধগম্য হল না বলে, (এর কথা পরে আরো

শুনতে পাবে) আমরা সবাই শীকারী, লাঠিয়াল বরকন্দাজ তার অনুসন্ধানে বের হ'লাম। জায়গাটির পাশে এক টুকরা জঙ্গল ছিল, সেটা কারো নজরে পড়ে নি, কেননা সেখানে গাছপালা, কি ঘন ঘাস, এমন কিছুই ছিল না যার আড়ালে আবডালে কোন জন্তু, এমন কি একটা বেড়ালও, লুকিয়ে থাকা সম্ভব! আমরা একবার নয়, দু'বার নয়, তিন তিনবার এর চারিদিক উটকে পাটকে দেখে যখন কোনই কিনারা করতে পারলাম না, তখন এরই পাশে যে আখের ক্ষেত ছিল, সেই দিকে খুঁজতে যাব মনস্থ করলাম। লাঠিয়ালরা সবে মাত্র দু'পা এগিয়েছে, কার কি কর্ত্তব্য সে বিষয়, আমার তাদের সব কথা বলা তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় আমি দেখতে পেলাম সেই জঙ্গলটার মধ্যে কি যেন নড়ছে, তারপর দেখি কিনা, চিতাটি বুকে হেঁটে মস্ত একটা টিক্‌টিকির মত এগিয়ে চলেছে। ভাগ্যিস আমার বন্দুকটা আমার কাঁধের উপর তৈরি ছিল। আচমকা শব্দ শুনে সবাই চমকে উঠল, আর মনে করলে সেটা হঠাৎ ফস্‌কে আওয়াজ হয়েছে, কিন্তু যখন বাঘটাকে ভূমিসাৎ হয়ে পড়তে দেখলে, তখন আর তাদের বিস্ময়ের পারাপার রইল না। আমরা যখন তার খোঁজে চারিদিক তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিলাম, তখন সে কেমন করে নিঃশব্দে লুকিয়ে ছিল, আর অতবার আনাগোণা করা সত্ত্বেও যে আমাদের চোখে পড়ে নি, এটা ভারী আশ্চর্য্যি মনে হয়।

বাঘ শীকারের একটা বিশেষ স্মরণীয় দিনের কথা তোমাদের এখানে বলা ভাল, তার মধ্যে একটু মজার কথা আছে। গেল-বৎসর ঘটনাটা ঘটেছিল। গল্পটা আমার আর K. G. B-র কাছে তোমরা অনেকবার শুনেছ। একটি বাঘিনী আমার নির্ঘাত গুলির

ঘায়ে মরে পড়েছে, আমরা সবাই মিলে, চারিদিক ঘিরে তার ডোরা-কাটা সুন্দর চামড়া খানির, আর নধর দেহের প্রশংসাবাদ করছি, জনবিশেক লাঠিয়াল কাছাকাছি, আর বেশির ভাগ পাহাড়ের মাথার উপর রয়েছে, আমাদের কাছে পৌঁছতে হলে, তাদের অনেক খানি পথ নেমে আসতে হবে, বাঘিনী-নিধন বার্ত্তা, লাঠিয়ালরা চীৎকার করে তাদের বলছে, তারা মহানন্দে পাহাড় হতে দৌড়ে নেমে আসছে, কাছাকাছি যারা ছিল তারাও ভিড় করে ঘিরে এসেছে, আমি আমার বন্দুকটি বাক্সবন্দী করেছি, এমন সময় প্রকাণ্ড এক ভল্লুক দম্পতির হুপ হুপ শব্দ আমার কাণে এসে পৌঁছল। K. G. B. বন্দুক হাতে এগিয়ে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করলেন, স্বাগত সম্ভাষণের মাহাত্ম্যে একটি ত তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হল, ইহজীবনের মত আর তার বাক্য নিঃসরণ হয় নি। অন্যটি চারিদিকে লাঠিয়াল শীকারীর গোলযোগে, বাঘ ভালুক মারা পড়বার বিভ্রাটের সুযোগে পলায়ন দিলে, সুখের বিষয় কারো কোন হানি করে যায় নি। আমি বাক্স হতে বন্দুকটি বার করে নেবার দু'এক মিনিটের মধ্যেই এত খানি কাণ্ড হয়ে গেল।

আর বেশি দূর না এগিয়ে, এলোমেলো ভাবে ঘুরে না বেড়িয়ে এখন কাজের কথায় মন দেওয়া ভাল। বাঘ আর চিতা শীকারের গল্প আমি প্রকৃত ঘটনা হতেই বলব। এ ব্যাপারে যেখানে সম্ভব, পায়ে হেঁটে শীকার করাই সব চেয়ে নিরাপদ উপায়, এ কথা জোর করে বলতে আমি একটুও দ্বিধা বোধ করছি নে—এ বিষয়ে প্রথম স্থান দিতে হবে Still Hunting-কে, অর্থাৎ এক স্থানে স্থির হয়ে বসে শীকার করাকে। এ কাজে প্রচুর অভ্যাস আর অলৌকিক ধৈর্য্যের আবশ্যক। এ ব্যাপারে অনেক সময় দেখা যায়, সেটা বিরক্তি-

জনক লুকোচুরি খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। শীকারী শুধু খুঁজেই মরে, কিন্তু অভীষ্ট লাভ হয়ত ভাগ্যে সহজে ঘটে না। লম্বা ঘাসে ভরা জঙ্গলে এমন ভাবে শীকার করা সম্ভব নয়—পাহাড়ে যায়গায় এ সুযোগ খোঁজা দরকার আর সুবিধাও পাওয়া সহজ। বৃহদাকার জন্তু বিশেষকে তার আপন জমিদারীর এলেকায়, এ ভাবে হাত করতে পারাই শীকারীর মৃগয়া-কৌশলের পরাকাষ্ঠা। যদি মৃগয়ার নিদর্শন, ব্যাঘ্ররাজের ডোরাকাটা আঙরাখা, ভাঙকের লোমশ কোমল কম্বল খানি, হরিণের শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড শৃঙ্গ যুগল, মহিষাসুরের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শৃঙ্গ-ফলক, বরাহ অবতারের খড়্গের মত যুগ্মদন্ত, সংগ্রহ করে গৃহের শোভা, আর আপনার বীর্য্য গৌরব স্মরণীয় করতে চাও তাহলে পরিশ্রম করতে হবে, যে মানুষ এগুলি অর্জ্জন করতে চায়, বিনিময়ে তাকে আপন জীবনের অনেক খানি অংশ, আর শ্রেষ্ঠ অংশই দান করতে হবে।

মধ্য-প্রদেশে অনেক পাহাড়তলী আছে, কিন্তু শীকারী সেখানে কমই যায়। কেননা সেখানে সহজ গতিবিধি, সৌখীন চালচলন চলে না। শীকার প্রত্যাশায় মৃত জন্তুর পাশে পাহারা দিয়ে বসে থেকে বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। টোপ গেথে মাছ ধরবার জন্যে চুপ করে বসে থাকতে হয়, বাঘকে ভুলিয়ে আনবার জন্যে পাঁঠা কি ভেড়া বনে বেঁধে রাখতে হয়, তাকে আকর্ষণ করে আনবার জন্যে এইটি সব চেয়ে ভাল উপায়। আর যদি তার কাছাকাছি কোন জন্তু বাঘের আক্রমণে মারা গিয়ে পড়ে থাকে, আর সেখানে জনসমাগম বিরল হয়, তাহলে বাঘটিকে তার মৃত-শীকারের কাছাকাছি নাগাল পাবার খুবই সম্ভাবনা। এই সব মৃত-শীকারের কাছে পৌঁছবার

জন্যে শীকারীর বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কান-কথার চেয়ে জোরে কোন কথা বলা চলে না, আর শীকারীও তাঁর অনুচরদের নিঃশব্দ পদ সঞ্চার পাওয়া আবশ্যক। প্রায়ই দেখা যায় এর কাছাকাছি কাক চিল গাছের ডালে বসে গলা বাড়িয়ে সতৃষ্ণ

ই দিকে চেয়ে আছে। তোমায় আসতে দেখে শেয়াল-গুলো মনভারী করে নিতান্ত অনিচ্ছায় অন্যত্র সরে পড়ছে। ময়ূরের কেকা ধ্বনি, যতক্ষণ বাঘ সেখান হতে অদৃশ্য না হচ্ছে, ততক্ষণ আর কিছুতেই নীরব হচ্ছে না, এই সব লক্ষণ হতেই বাঘটি যে কোথায় আস্তানা নিয়েছে, তা বোঝা যায়। এখন তার কাছাকাছি পৌঁছতে হলে, গাছের আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে, আস্তে আস্তে এগোন ভাল, সম্ভব হলে মাঝে মাঝে দু'এক চক্র ঘুরে ঘুরে যাওয়া মন্দ নয়, কিন্তু কখনই নালা কিম্বা নদীর শুক্‌ন খাল কিম্বা ঘন ঘাসে ঢাকা মাঠ দিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

ময়ূর জাতের কেন কে জানে বাঘ সম্বন্ধে ভারী একটা মোহ আছে—কি যে মায়ামন্ত্র ব্যাঘ্রবীরের জানা আছে কিনা জানিনে, কিন্তু ময়ূর এদের কাছাকাছি থাকতে পারলে দূরে যেতে চায় না। জঙ্গলবাসী শীকারীরা দেখে শুনে এই গুণ-জ্ঞানের ঠিক খবর জেনে নিয়েছে, আর শীকার করবার সময় এই দুর্ব্বলতার বিশেষ সুবিধা নিয়ে থাকে। আমি একবার শীকার করতে গিয়ে, বনের মধ্যে তাঁবুতে বসে ছিলাম, এক ঝাঁক ময়ূর কাছাকাছি চরছিল, দেখলাম একজন শীকারী বাঘের মত ডোরা-কাটা একটা হল্‌দেটে রঙের পর্দ্দা নিজের সম্মুখে আড়াল করে ধরে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। ময়ূর স্বভাবত ভারী ভীরু আর লাজুক, কিন্তু বাঘের মত এই ডোরা-টানা পর্দ্দা দেখে

তারা ভারী উত্তেজিত হয়ে উঠল, পর্দা যতই এগোয় ময়ূরগুলি ততই স্ফূর্ত্তি করে, বিচিত্র কলাপ আর পাখা মেলে আনন্দে নেচে নেচে ঘুরে বেড়ায়। গ্রাম্য শীকারীটি পঁচিশ গজের মধ্যে গুলি করে একটিকে হাত করলে, কিন্তু তবুও অন্যেরা তখনও নিরাপদ হবার জন্যে পালিয়ে গেল না। পাগলের মত কলরব করে সেই পর্দারই আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল, ইত্যবসরে শীকারী আরো একটিকে গুলি করে মেরে সামনের পর্দা ফেলে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে। এই পর্দাকে তারা বলে 'বাঘিনী'—মোহিনী শক্তির আধিক্যবশত বোধ হয় স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার চলেছে। সে যাই হোক, অনেকবার এ কথা শুনেছিলাম কিন্তু চোখে না দেখা অবধি বিশ্বাস করি নি। অমন সুন্দর পাখী মেরে ফেলা ভারী নিষ্ঠুরতা, তবে অমন নিষ্ঠুরতা যে আমার চোখের সমুখে ঘটতে দিয়েছিলাম, তার একমাত্র কারণ, শোনা-কথার সত্য পরীক্ষা। আমি মনে করেছিলাম যে তার বড়াই নিতান্তই গাল-গল্প, কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল অন্য রকম। সে বল্লে ময়ূর শীকার করা যে শীকারীদের ব্যবসা, তাদেরি কাছে এই বাঘিনীর চাতুরিটা সে শিখে নিয়েছে। এই শীকারীরা তীর ধনুকে ময়ূর শীকার করে থাকে। কোন কোন বন্য প্রদেশে যেখানে চারিদিক শুল্ম কিম্বা ঘন তৃণ-সমাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বালুকার স্তূপ আর জলহীন নালার প্রাদুর্ভাব, সেখানে শীকারী হাতী পাঠিয়ে, বাঘকে তাড়িয়ে তার হত-শীকারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। বলা বাহুল্য, যে হাতী এ বিষয় বিশেষ রূপে শিক্ষা পেয়েছে সেই কাজে লাগে, আর এমন একটি হাতী সহজে বড় একটা পাওয়া যায় না।

হাতীর উপর হাওদা দেওয়া হয় না, জিন-সওয়ারীর মত বসতে

হয়, পা রাখবার জন্যে দু'টি জায়গা থাকে, এটা বীরাসন সন্দেহ নাই কিন্তু নিরাপদ নয়, বিশেষত পথে এগবার সময় বার বার ডাল পালার বাধা অতিক্রম করতে হয়। এর উপর যদি দ্বীপেন্দ্রটি বীরেন্দ্র না হয় তাহলে সমূহ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। এমন একটি বিপুল বপু অনাহূত আগন্তুককে অকস্মাৎ আসতে দেখে বাঘ কিম্বা চিতা, এম্নি স্তম্ভিত হয়ে যায় যে প্রথম গুলি মারবার বিষয়ে কোন বাধা দেয় না। সম্বর হরিণও ঘন ঘাস-বনের মধ্যে ঠিক একই ব্যবহার করে। আর অযোধ্যায় যেখানে বহু চিত্রক হরিণের বসতি, স্বচ্ছন্দ আহার বিহারে প্রকাণ্ড আয়তনের হয়ে ওঠে, তাদেরও আমি অনেক বার অনেক গুলিতে এই উপায়ে শীকার করেছি।

এই রকম হাতীর উপরে বসে শীকার করতে গেলে, একটি বিষয়ে তোমাদের বিশেষ করে সাবধান হতে হবে। যে মুহূর্ত্তে বনের মধ্যে প্রবেশ করবে আর যতক্ষণ না বনের বাহিরে আসবে ততক্ষণ কিছুতেই নিজের বন্দুকটি হাত ছাড়া করবে না, তা সে যতই ভারী হোক না কেন? হঠাৎ যে পথে কখন কার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটবে বলা কঠিন, বিপদ যে এসে দেখা দিয়ে যাবে না এ কথা কে বলতে পারে? না যদি আসে, সে ত ভাল কথা কিন্তু বনের মধ্যে হাতীর পিঠে চড়ে, শীকারের খোঁজে বেরতে হলে, আগে হতে সাবধান হওয়াই ভাল, জান ত কথায় বলে "সাবধানে বিনাশ নাই"। আর তা ছাড়া নিজের বন্দুকটির সঙ্গে পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হয় ততই ভাল, তাকে যখন তখন কাঁধে পিঠে করে নিয়ে বেড়ালে তার সঙ্গে এমনি বন্ধুত্ব জন্মায় যে বিপদের মুখে সে সহায় হয়ে নিশ্চয়ই দাঁড়ায়, আর অনায়াসে তার সাহায্যে শত্রু বিনাশ হয়ই হয়। যারা ক্রিকেট,

হকি, টেনিস খেলে তারা জানে, ব্যাটের সঙ্গে ভাব রাখলে সময়ে কাজ দেখে!

P.—একবার জঙ্গলে মাচান বাঁধা ঠিকমত হচ্ছে কিনা দেখতে গিয়েছিলেন, আমি বার বার বলা সত্ত্বেও বন্দুকটি নিলেন না, রেখে গেলেন। একটা সরু নালা পার হয়ে যাচ্ছিলেন, তার দু'ধারে খাড়াই পাড়, ঝোপ ঝাড়ে একেবারে ঢাকা, বেশি দূর যেতে না যেতেই একটা মস্ত বাঘ একেবারে কানের কাছ দিয়ে লাফিয়ে পড়ে গজেন্দ্র-গমনে চলে গেল। P.—যে হেঁটে যাচ্ছিলেন তাঁর পায়ের শব্দ কিম্বা পাথর গড়িয়ে পড়বার শব্দে সে চমকে উঠে থমকে,—পালিয়ে গেল। উভয় পক্ষেই কি সুযোগ হারালে বল দেখি! P.—কে তোমাদের মনে আছে ত? Bisley আর অন্যত্র কত প্রাইজ আর মেডাল সে পেয়েছিল, শেষ কালে একটা জ্বলন্ত বাড়ী হতে বসন্ত রোগী ছোট্ট একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়ে, সেই রোগে বেচারী দু'চার দিনের মধ্যে নিজেই মারা গেল।

সেই জঙ্গলেই আমি একদিন চিতলের খোঁজে খোঁজে বহুদূর বিস্তৃত ঘন বাঁশবনের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম। থেকে থেকে ময়ূরের কর্কশ কেকা ধ্বনি কিম্বা কপোতের ঘুঘুগান ছাড়া আর কিছুতে চারিদিকের পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে অরণ্য-সুলভ দু'একটি অপরিচিত অশ্রুত পূর্ব্ব শব্দ কানে আসছিল, তার, কোথা কিম্বা কেন কিছুই বোঝা যায় না। এই বিরল শব্দগুলিই যেন নিস্তব্ধতাকে আরো গাঢ়তর ও অস্বস্তিকর করে তোলে। কখনো কোন মৃত্তিকার স্তূপ ডিঙিয়ে, শুক্‌নো গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে কেবলি এগিয়ে চলেছি, একবার মনেও হয় নি, যে কোন কিছু হঠাৎ আমার

সম্মুখে এসে পড়বে কিন্তু তবুও চোখ যদিও কিছু দেখতে কিম্বা কান কিছু শুনতে পায় নি, হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, কি যেন একটা আসছে, তারপর চোখ তুলেই দেখলাম—প্রায় চল্লিশ হাত দূরে একটা প্রকাণ্ড হাতী, কুলোর মত কান দুটো খাড়া করে, শুঁড় গুটিয়ে তুলে সোজা আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিচার বিবেচনার সময় ত আর তখন ছিল না, আমি তাড়াতাড়ি একটা ঘন বাঁশ ঝাড়ের মধ্যেই লুকিয়ে পড়লাম, যদিও আমার পিছু পিছু আসবার কোন পায়ের শব্দ আমি শুনতে পাই নি, তবুও সেদিকে কি ঘটছে দেখবার জন্যে আস্তে আস্তে মুখ ফেরালাম—দেখলাম পর্ব্বত-প্রমাণ একটি হস্তিনী শুঁড় তুলে হুঙ্কার করতে করতে দ্রুত অন্তর্ধান হল—গজেন্দ্র গমনে নয়। যদি আমি আর দু'চার হাত এগিয়ে যেতাম, বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে না আশ্রয় নিতাম, তাহলে কি যে ঘটত সে সম্বন্ধে অধিক না-ভাবা আর না-বলাই ভাল। আমার হাতে শুধু 12 bore Nitro Paradox ছিল, আর তোমরা ত জান হাতী মস্ত বড় জানোয়ার হলেও কেমন অনায়াসে অতি অল্প পরিসর স্থানে সত্বর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করতে পারে। তাই Paradox আর আমার পদযুগলের সম্মিলিত চেষ্টাতেও প্রাণ রক্ষা হত না, সেটা সুনিশ্চিত!

ক্রমশ—

বিসর্জ্জন।

তার নামটি ছিল টুলু; সে ছিল আমার বাল্য-সহচরী। তার সম্পর্ক, পৃথিবীর আকাশ এবং পৃথিবীর বাতাস সম্পূর্ণরূপ পরিহার করে' আমারই প্রাণে—আমার মর্ম্মের গভীর বেদনাতেই নিমগ্ন হয়ে রয়েছে।

সে থাকত আমাদের পাড়ার রায়দের বাড়ীতে। কিন্তু রায়দের দেহের যে শোণিত-প্রবাহ, তার সঙ্গে তার রক্তের যোগ ছিল না; আবার প্রীতি বা স্নেহের কোন যোগসূত্রে তাদের হৃদয়ের সঙ্গে তার যে কোন বন্ধন পড়েছিল, এমনও নয়। ঐ ক্ষুদ্র একটি বালিকা যেন ছিল রায়-পরিবারের মস্ত একটা দায়।

টুলুর এক মামি-মা ছিল রায়দের ঘরের ঝিয়ারী, সে যখন বিধবা হয়ে তার বাপের বাড়ী এল, তখন অনাথা ভাগিনেয়ীটিকেও সে তার সঙ্গে আনল। বিধবা-মেয়ের অস্তিত্বের গুরুভার আর রায়দের বেশি দিন বইতে হল না, কিন্তু মৃত্যুকালে একটি অনাথা বালিকাকে লালন পালন করবার দায় সে তার মা বাপের ঘাড়েই চাপিয়ে গেল।

জীবনটাকে আঁকড়ে ধরবার একটা সুযোগ টুলু পেয়েছে, কিন্তু রায়দের বাড়ীতে যে অবস্থায় তার দিন কেটেছে,—পশু-প্রদর্শনীর পশুর যে দশা, তার তুলনায় তা ছিল আরো দুর্ব্বহ। বাড়ীর লোকদের দৃষ্টি এড়িয়ে এবং তাদের মনের যোগ ছিন্ন করে বালিকার

ক্ষুদ্র প্রাণ-পাখীটি মুক্তির অবাধ আকাশে আনন্দে যে ডানা মেলবে, অমন অবকাশ তার খুব অল্পই ছিল; নিরন্তর তাকে পর্য্যবেক্ষণ করে' আতিপাতি করে' তার দোষগুলো বের করবার এবং নানাভাবে তাকে গঞ্জনা দেবার উদ্যম ও উৎসাহ বাড়ীসুদ্ধ লোকের একান্তরূপেই ছিল। টুলু যে তাদের আপনার কেউ নয়, অথচ তাকে পালন করবার দায় তাদেরই, এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মরণ হতে না পেরে তাকে নিয়ে তাদের কারুর আর স্বস্তিবোধ ছিল না। অনাথা বালিকাটির মুখের অন্ন তুলে ধরে তারা তার জীবন রক্ষা করেছে বটে, কিন্তু তার প্রতি তাদের অন্তরের যে অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ ভাব, তার বদ্ধ হাওয়াতে শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটি নিরন্তর গুমরে মরেছে।

আমার বিধবা-মায়ের আমিই ছিলুম একমাত্র সন্তান। তাঁর হৃদয়ের অজস্র স্নেহরাশি আমার ক্ষুদ্র প্রাণ-পাত্রটি কাণায় কাণায় ভরে' তুলে' আরো যেন উপচে পড়েছে, আর তার বিভিন্ন ধারার একটি ধারা ঐ অনাথা বালিকাকে আশ্রয় করেই বেগে প্রবাহিত হয়েছে। টুলুর কচি হৃদয়খানি কষাঘাতে নিরন্তর জর্জ্জরিত হয়েছে, থেকে থেকে দু'এক মুহূর্ত্তের ফাঁকে বালিকার অন্তরের ঐ ক্ষত স্থানে আমার মা-ই তাঁর স্নেহের হাতখানি বুলিয়েছেন। কিন্তু আমাদের বাড়ী টুলু যে এসেছে, তার দরুণ তাকে ঢের কথা শুনতে হয়েছে। রায়দের বাড়ীর দৃষ্টি গুপ্তচরের মত অলক্ষ্যে তাকে অনুগমন করে' সদাসর্ব্বদা তার গতি বিধি নিরীক্ষণ করেছে। ভালমন্দ সামগ্রী যখন যা-কিছু আমাদের বাড়ীতে হয়েছে, মা হয় ত হেঁসেল ঘরের এক কোণে বসিয়ে তাকে খাইয়ে দিয়েছেন, কিন্তু রায়দের দৃষ্টি সেখানে গিয়েও পৌঁচেছে। টুলুকে তারা কত গালিগালাজ করেছে,—এক

রতি মেয়ে, কিন্তু তার উদরখানি যেন কুম্ভকর্ণের মত, বাড়ীতে এত যে খায় তবু কি তৃপ্তি আছে, আবার এবাড়ী ওবাড়ী গিয়ে পাত না পাতলে মেয়ের দিন আর যায় না। কিন্তু, অত যে বিড়ম্বনা, তবু টুলুর আমাদের বাড়ী আসা ক্ষান্ত হয়নি; দু'বেলা অন্তত দু'টিবার সে আমাদের বাড়ীতে প্রতিদিনই এসেছে।

আমি তখন গ্রামের মধ্য ইংরেজি স্কুলে নীচের এক ক্লাশে পড়তুম; ইস্কুলে যারা ছিল আমার সহপাঠী, ইস্কুলের বাইরে আমি তাদের সম্পর্ক বড় একটা রাখতুম না। আমি ছিলুম বিধবা-মায়ের একমাত্র সন্তান; মায়ের অঞ্চলখানি আমাকে সদাসর্ব্বদা আকস্মিক বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেছে। ইস্কুলের ক'টি ঘণ্টা ব্যতীত বাড়ীর বার হবার, এবং অন্যান্য ছেলেপিলেদের সঙ্গে দৌড় ধাপ ও ছুটোছুটি করবার অবকাশ আমি খুব অল্পই পেয়েছি; অধিক সময় আমার কেটেছে অন্তঃপুরেই। ঐ সময় টুলু যখন একটু ফাঁক পেয়েছে আমাদের বাড়ীতে এসেছে, একটি নিঃসঙ্গ বালকের হৃদয়ের কারবার দিনে দিনে তাকে নিয়েই জমেছে।

ইস্কুল থেকে আমি বাড়ী ফিরেছি; তার অল্পক্ষণ পরেই টুলু আমাদের বাড়ীতে এল; সেদিন বালিকার কচি প্রাণের পল্লব আরো যেন নেতিয়ে পড়েছিল। আমার সুমুখে চুপটি করে এসে সে দাঁড়ালে, যেন নীরব মনোবেদনার জ্যান্ত একটি সাকার রূপ। বালিকার তাপ--দগ্ধ চিত্তে যে মুহূর্ত্তে একটি বালক-হৃদয়ের স্নিগ্ধ ও সুশীতল স্পর্শখানি লাগল, তার অন্তরের যে একটা নিবিড় বেদনা, তার পারিপার্শ্বিক হাওয়ার উত্তাপে এখনও অশ্রু হয়ে ঝরবার অবকাশ পায় নি; সেই নিমেষে তার দুটি ডাগর আঁখির পাতায় বিন্দু বিন্দু হয়ে

দেখা দিল। বালিকার প্রাণে সেদিনের একটি বিশেষ ঘটনা অতি নিদারুণভাবে আঘাত করেছিল।

টুলুকে ত বাড়ীসুদ্ধ লোক তাড়নাই করেছে, তাদের কাছে তার চিত্ত সদাসর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েই রয়েছে, সেখানে যার সাহচর্য্যে বালিকার হৃদয়খানি ঈষৎ মেলেছে, সে হচ্ছে তার প্রিয় সুহৃদ একটি বিড়াল। অবজ্ঞা ও অনাদরের পাঁচিল অলঙ্ঘ্য হয়ে যেখানে উঠেছে, বালিকার অন্তরাত্মা থেকে থেকে যেন ঐ একটি ক্ষুদ্র জানলার অল্প একটু ফাঁকে মুখখানি বাড়িয়ে আলো-আকাশের আনন্দ-মূর্ত্তির ঈষৎ পরিচয় পেয়েছে।

টুলু বিড়ালটিকে বড় ভাল বেসেছে; বাড়ীর লোকদের বিষ-দৃষ্টির অন্তরালে কোন একটি নিরাপদ স্থানে কখনো সে যদি তার সাক্ষাৎ পেয়েছে, তাকে কোলে করে গায়ে তার কত হাত বুলিয়েছে, তাকে কত সোহাগ কত আদর করেছে; তার ব্যথায় কত সমবেদনা জানিয়েছে। আবার বিড়ালটিও ছিল এমনিতর যে বাড়ীর আর আর ছেলেপিলে যদি তার গায়ে হাত দিয়েছে, অমনি সে হয় ত দৌড়ে পালিয়েছে, অথবা হিংস্র একটি জীবের মতই ধারালো নখের সাহায্য নিয়েছে; আর টুলু যখন গিয়েছে, শান্তশিষ্ট শিশুটির মত তার কোলে এসেছে। বিড়ালটার সঙ্গে টুলুর যে অতটা সৌহার্দ্য ভাব, ওটা যাতে ব্যক্ত না হয়, সেদিকে ঐ ক্ষুদ্র বালিকার যদিও বিশেষ সাবধানতা ছিল, তবু বেশি দিন আর তা গোপন রইল না। আর যখন প্রকাশ পেল যে, বিড়ালটা টুলুরই একান্ত অনুরক্ত, তখন ঐ বিড়ালের সম্বন্ধে বাড়ীর লোকদের মনোভাব বিষ হয়েই উঠল। সেদিন টুলুর বড়ই আদরের ঐ যে বিড়ালটি, তার বিষাদঘন চিত্তে, সুদূর আনন্দ-লোকের একটি

ক্ষীণ আলোক-রশ্মি বহন করে এনেছিল, তাকেই—ঐ বালিকার যারা নিষ্ঠুর বিধাতা, তার প্রাণের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটি নদীর পারে 'অন্তরীণ' করেছিল ; আর বালিকা, তার অন্তরে নিদারুণ একটা আঘাত পেয়ে, আমারই কাছে এসেছিল তার সে বেদনা জানাতে।

অশ্রুভরা দুটি চোখের দৃষ্টি আমার মুখের দিকে তুলে ধরে টুলু আর্দ্রকণ্ঠে যখন জানালে, "তারা আমার বিড়ালটাকে নদীপার করে দিয়েছে"। বালকের মন তখন যেন একেবারে উদ্ধত হয়ে উঠল,—বালিকার প্রাণে তারা অন্যায়রূপে যে নিষ্ঠুর ব্যথা দিয়েছে, তার একটা প্রতিবিধান করবার উদ্দেশে। আমি সান্ত্বনা দিয়ে তাকে বললুম, "আমাদের বিশুকে কালই ওপারে পাঠাব, এবার তোমার বিড়ালটিকে আনিয়ে আমাদের বাড়ীতেই রেখে পুষব, দেখব কে আবার তাকে নদীপার করে"।

বিশু আমাদের বাড়ীর একটি চাকর, আমার সকল আবদার ঐ বিশুই শুনত। সেদিন বিশু বাড়ীতে উপস্থিত ছিলনা, নতুবা আমি তাকে সেই মুহূর্ত্তেই পাঠাতুম ; সময়ের অপেক্ষা আমারই সইছিল না। বালিকার দুঃখ সেই দণ্ডে ঘুচিয়ে তার প্রীতিসাধন করবার জন্য একটি বালকের অন্তর বড়ই উদ্বেল হয়ে উঠল। নদীটি আমাদের বাড়ী থেকে প্রায় একপোয়া মাইল দূরে ছিল ; টুলুকে সঙ্গে করে' আমিই গেলুম, যদি বিড়ালটার কোন সন্ধান করতে পারি। যখন পাড়ের উপর এসে আমরা দাঁড়ালুম, শুনলুম, ওপারের একটা ঝোপের আড়ালে বসে বিড়ালটা মিউ-মিউ করে কাঁদছে। বিড়ালের কান্না শুনতে পেয়ে, টুলু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল ; "আয় আয় পুষি আয়, আয় আয় পুষি আয়"।

বিড়ালটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে, জলের একেবারে কিনারাতে এসে দাঁড়াল, কিন্তু নদীতে সাঁতার দিতে সে আর সাহস করল না ; আবার পাড়ের উপরে উঠে গিয়ে এবার আরো বেশি কাত্‌রাতে লাগল। টুলু হতাশ হয়ে আমার মুখের দিকে চাইল,—তার ঐ চোখের চাহনি অন্তরের দারুণ কাতরতাই জ্ঞাপন করছিল। বালিকার প্রতি আমার অন্তরের সহানুভূতি আমাকে জানিয়ে দিল, যে বিড়ালটিকে যদি ঐখানে ঐ অবস্থাতে রেখেই আজ বাড়ীতে ফিরি, সারা রাত তার বেদনা-বিদ্ধ হৃদয় অশ্রু হয়েই ঝরবে। বালিকার ঐ অশ্রু নিবারণ করবার আগ্রহ বালকের স্বাভাবিক ভীরুতার অন্তরে একট দুঃসাহস জাগিয়ে তুললে।

নদীর এক ঘাটে ছোট একখানি ডিঙ্গি-নৌকো বাঁধা ছিল, আমরা দু'জনেই গিয়ে ঐ নৌকোতে উঠলুম। নদীর গভীরতা তেমন ছিল না, কষ্টে শ্রেষ্টে নৌকা আমি পাড়ে নিলুম ; কিন্তু নৌকাখানি সিধে ভাবে না গিয়ে এদিক ওদিক করতে করতে, স্রোতের টানে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়ল। সেখানে একটি জায়গায় নৌকো ভিড়িয়ে রেখে, দুজনেই পাড়ের উপর এসে দাঁড়ালুম; টুলু আবার ডাকল, আয় আয় পুষি আয়, আয় আয় পুষি আয়'। পুষি এবার বালিকার গলার আওয়াজ পেয়েই, দৌড়ে তার সামনে এসে উপস্থিত হল।

যখন ওপারে আমার নৌকাখানি ভিড়েছিল তখনই সন্ধ্যা ; এবার ফিরবার কালে যখন আমরা নদীর বুকে, তখন সাদা মেঘের টুকরোর মতই দিবাভাগের নিষ্প্রভ চাঁদ, জগৎ-মায়ের কপালে একটি রজতের টিপ হয়ে জ্বলে উঠেছিল। প্রকৃতি তার অঙ্গের ধূম্র-ধূসর বসনখানি উন্মোচন করেছিল, তার দেহ থেকে আলোর উৎস ছুটে

ছিল। আর নদীটির যেদিক পানে গতি তার বিপরীত দিকে, দিগন্তের তরুশ্রেণীর মাথার উপরে,—নিবিড় একখানি মেঘ, একটি বিরাট বিহগের মতই পক্ষ বিস্তার করেছিল। আকাশ যেন উতলা হয়ে এদিক ওদিকে ছুটেছিল; তার ত্রস্ত-পদক্ষেপে নদীর বুক থেকে থেকে বিষম চাঞ্চল্য জেগে উঠেছিল। টুলু,—নৌকোর আগ-গোলুয়ের দিকে একটি জায়গায় বিড়ালটিকে কোলে করে বসে, নদীর দিকে একবার ঝুঁকে পড়ে দেখছিল যে যাদুকরের হাতের একটি রজত-মুদ্রার মত নদীর গর্ভে আকাশের একটি চাঁদ থেকে থেকে দশটি হচ্ছে, কখন বা একটি মশালের মত জ্বলে উঠছে, আবার এক একবার নদীর বক্ষে—চন্দ্রমা যেন সোনার একখানি মাদুর হয়ে বিছিয়ে যাচ্ছে।

বাড়ীর পুকুরঘাটে মা আমাকে অল্প বয়সেই সাঁতার শিখিয়েছিলেন, কিন্তু আমার বড় বেশি ভয়-ভাবনা হতে লাগল টুলুর জন্যে। টুলুকে আমি বার বার সাবধান করলুম; কিন্তু বালিকার অন্তরের সাবধানতা সেদিন কি ছিল? হারিয়ে-যাওয়া যে অমূল্য নিধি, তার স্নেহানুরক্ত একটি বালকের প্রয়াস তাকে মিলিয়ে দিয়েছিল, বালিকা তার ঐ ফিরে-পাওয়া ধন বুকে ধরে, রাক্ষস-পুরীর যে রাজ-কন্যা রাক্ষসদের সহবাসে অতি দুঃখে যার দিন অতিবাহিত করেছে, তারই মত প্রণয়-পাশে বদ্ধ একটি রাজপুত্রেরই যেন অনুসঙ্গিনী হয়ে, স্রোতে তার ডিঙ্গা ভাসিয়েছিল। রূপকথার কৌটোটির মতই যেন একটি কৌটো—ঐ একটি অনাথা বালিকার অন্তরে, এতকাল তার দুঃখ বিড়ম্বনার পাথর-চাপা হয়ে পড়েছিল, সে দিন ক্ষণকালের অবকাশে তার ঐ কৌটোর ডালাখানি যেন সরেছিল।

বালিকার প্রাণে আনন্দের হাট বসেছিল। নৃত্য-শীলা পরীদের সুস্বর-সম্বলিত উল্লাস-সঙ্গীতে তার হৃদয়ের দিক-দিগন্ত যেন মুখরিত হয়ে উঠেছিল। নদীর এ-পারে ও-পারে যে আলো, প্রিয়জনের সহস্র চুম্বন-বর্ষণের মত অজস্র ধারায় এসে গাছের শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় পড়েছিল, ঐ আলোকের মদে সেদিন টুলু তার অন্তরের শূন্য পেয়ালাটি ভর্ত্তি করেছিল। যে বাতাস দশাগ্রস্ত ভক্তের মত, নদীর তীরে, ধানের ক্ষেতের সোণার প্রাঙ্গনে আনন্দে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, সেই হাওয়াতে বালিকার চিত্ত যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটেছিল। তাকে কত আমি সতর্ক করলুম, তবু তার অস্থিরতা কিছুতে গেল না; এক একবার জলের দিকে আরো ঝুঁকে পড়ে, বালিকা উল্লসিত চিত্তে নদীর বুকে চাঁদের খেলা দেখতে লাগল। একটা হাওয়ার বেগ একবার উদ্দাম হয়ে এসে, আমার নৌকোখানিকে জোরে ধাক্কা দিয়ে জেলেদের একটা বাঁশের সঙ্গে লাগিয়ে দিলে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লগি ঠেলছিলুম, সে ধাক্কাটা সামলে উঠতে না পেরে জলের ভিতর ডিগবাজি খেয়ে পড়লুম। তারপর আবার যখন আমি জেগে উঠলুম; দেখি যে হাওয়ার প্রবল বেগ আমার নৌকোখানিকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, আর অন্য একখানি নৌকো বেয়ে কারা যেন আমার দিকেই আসছে। আমার সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্ক ও ত্রাসে আড়ষ্ট হয়ে আসছিল; জেলেদের বাঁশটি নিকটে পেয়ে, সেইটে ধরে আমি নেয়েদের ডাকাডাকি করতে লাগলুম।

টুলুর বিড়ালটাকে পার করে' নেবার উদ্দেশ্যে ছোট্ট একখানি ডিঙ্গিতে উঠে, আমি টুলুকে সঙ্গে করে ও-পারে গিয়েছি, মায়ের কানে কি করে যেন এ-সংবাদ পৌঁচেছে। মা বড়ই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে

দু'জন লোক আমার খোঁজে পাঠিয়েছেন। তারাই একখানি নৌকো-বেয়ে আমার দিকে আসছিল। যখন কাছে এসে তারা আমাকে তাদের নৌকোতে তুললে, তখন দেখলুম আমার ডিঙ্গিখানি খানিকটা দূরে গিয়ে, পাড়ের উপ্‌ড়ে-পড়া একটা গাছের সঙ্গে বেধে রয়েছে। টুলু সে নৌকোতে নেই। বালিকার কোলে তার আদরের যে বিড়ালটি ছিল, সাঁতার দিয়ে সেটি তীরে উঠেছে ও সেখানে এক জায়গায় বসে মিউ মিউ করে' ডাকছে। অবোধ জন্তু জানেনা যে, সে যার প্রতীক্ষায় আছে সে আর কখনো আসবে না, তার ভালবাসার ধনকে বাঁচাতে গিয়ে সে আজ নিজে প্রাণ হারিয়েছে!

শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার।